অশনি সংকেত

নদীর ঘাটে তালগাছের গুড়ি দিয়ে ধাপ তৈরি করা হয়েছে। দুটি স্ত্রীলোক স্নানরতা। একটি স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অল্পবয়েসী।ত্রিশের সামান্য কিছু নিচে হয়তো হবে। অপরটি প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়া বললে—ও বামুন-দিদি, ওঠো—কুমির এয়েচেনদীতে—

অপরা বধূটির উঠবার ইচ্ছে নেই জল থেকে এততাড়াতাড়ি, সে কোনো জবাব না দিয়ে গলাজলে দাঁড়িয়েরইল।

—বামুন-দিদিকে নিয়ে আর কক্ষনো যদি নাইতে আসি!

—রাগ কোরো না পুঁটির মা—সত্যি বলচি জলে নামলেআমার আর ইচ্ছে করে না যে উঠি—

—কেন বামুন-দিদি?

—যে গাঁয়ে আগে ছিলাম সেখানে কি জলকষ্ট! সে যদি তুমি দেখতে! একটা বিল ছিল, তার জল যেতো শুকিয়ে, জষ্টিমাসে এক বালতি জলে নাওয়া, অথচ তার নাম ছিল পদ্মবিল—

বধূটি হি হি করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে—পদ্মবিল!দ্যাখো তো কি মজা পুঁটির মা? চত্তির মাসে জল যায় শুকিয়ে, নাম পদ্মবিল—

এই সময়ে একটি কিশোরী জলের ঘাটে নামতে নামতে বললে—অনঙ্গ-দিদি, তোমার বাড়িতে কলু তেল দিতে এসেদাঁড়িয়ে আছে—শিগ্‌গির যাও, আমায় বলছিল, আমি বললামঘাটে যাচ্চি—ডেকে দেবো এখন—

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি তখনো থামেনি। সে বললে—তোরবৌদিদির কাছে গল্প করছি পদ্মবিলের—জল থাকে না চত্তিরমাসে—নাম পদ্মবিল—

মেয়েটি বললে—সে কোথায় অনঙ্গ-দি?

—সেই যেখানে আগে ছিলাম—সেই গাঁয়ে—

—সে কোথায় ?

—ভাতছালা বলে গাঁ, অম্বিকাপুরের কাছে—

—তোমার শ্বশুরবাড়ি বুঝি?

—না। আমার শ্বশুরবাড়ি হরিহরপুর, নদে জেলা।সেখানে বড্ড চলা-চলতির কষ্ট দেখে সেখান থেকে বেরুলামতো এলাম এই পদ্মবিলের গাঁয়ে—

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে এখানে।

অনঙ্গ জল থেকে উঠে বাড়ি চলে গেল।

গ্রামখানিতে এরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ-পরিবার, আর সবাই কাপালী ও গোয়ালা। নদীর ধারে এ গ্রাম বেশিদিনের নয়। বসিরহাট অঞ্চলের চাষি, জমি নোনা লেগে নষ্ট হওয়াতেসেখান থেকে আজ বারো-তেরো বছর আগে কাপালীরা উঠে এসে নদীতীরের এই অনাবাদী পতিত জমি সস্তায় বন্দোবস্তকরে নিয়ে গ্রামখানা বসিয়েছিল। তাই এখনো এর নাম নতুনগাঁ, কেউ কেউ বলে চর পোলতার নতুন পাড়া।

অনঙ্গদের বাড়ি গোয়ালপাড়ার প্রান্তে, দুখানা মেটে ঘর।খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নউঠানের ধারে ধারে পেঁপে ও মানকচু গাছ। চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েছে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশেগোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়শ গাছ।

অনঙ্গ এসে দেখলে বদ্যিনাথ কলু বড় একটা ভাঁড়ে প্রায়আড়াই সের খাঁটি সর্ষে-তেল এনেচে। তেল মাপা হয়ে গেলেবদ্যিনাথ বললে—মা-ঠাকরুণ, আজ আর সর্ষে দেবেন নাকি?

—উনি বাড়ি এলে পাঠিয়ে দেবো। এখন এই তেলেএক মাস চলে যাবে—

—আর পয়সা ছ'টা?

—কেন, খোল তো নিয়েচ, আবার পয়সা কেন?

—ছটা পয়সা দিতে হবে সর্ষে ভাঙানির মজুরি। খোলেরআর কত দাম মা-ঠাকরুণ। তাতে আমাদের পেট চলে?

—আচ্ছা উনি বাড়ি এলে পাঠিয়ে দেবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়েস এগারো বছর, তার ডাক নাম পটল। ছোটটি আট বছরের। তাকে এখনো খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছেলে—এসবতরিতরকারির ক্ষেত সে-ই করেচে বাড়িতে। এখন সে উঠোনের একপাশে বসে বেড়া বাঁধবার জন্যে বাঁশের বাখারি চাঁচছিল। ওর মা বললে—পট্‌লা ওসব রাখ, এত বেলা হল, দুধ দেয়নি কেন দেখে আয় তো?

পটল বাখারি চাঁচতে চাঁচতেই বললে—আমি পারবো না।

—পারবি নে তো কে যাবে? আমি যাবো দুধ আনতে সেই কেষ্টদাসের বাড়ি?

—আহা, ভারি তো বেলা হয়েছে, এখন বেড়াটা বেঁধে নিই, একটু পরে দুধ এনে দেবো—

—না, এখুনি যা।

—তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবা বাড়ি এলে আর বেড়াবাঁধতে পারবো না। এই দ্যাখো ছাগল এসে আজ বেগুন গাছখেয়ে গিয়েচে।

খোকা এসে বললে—মা, আমি দুধ আনবো? দাদা বেড়া বাঁধুক—

অনঙ্গ সে কথা গায়ে না মেখে বললে—খোকা, গাছথেকে দুটো কাঁচা ঝাল তোল্, তোদের মুড়ি মেখে দি—

খোকা জেদের সুরে বললে—আমি দুধ আনবো না মা?

—না।

—কেন, আমি পারি নে?

—তোকে বিশ্বাস নেই—ফেলে দিলেই গেল!

—তুমি দিয়ে দ্যাখো। না পারি, কাল থেকে আর দিয়ো না।

—কাল থেকে তো দেবো না, আজকের দু'সের দুধ তোবালির চড়ায় গড়াগড়ি খাক! তোর সর্দারি করবার দরকার কিবাপু? দুটো কাঁচাঝাল তুলতে বললাম, তাই তোল্।

এমন সময়ে পটলের বাবা গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বাড়ি ঢুকেবললে—কোথায় গেলে—এই মাছটা ধরো, দীনু তীওর দিলে, বললে সাত-আটটা মাছ পেয়েছি—এটা ব্রাহ্মণের সেবায়লাগুক। বেশ বড় মাছটা—না? এই পটলা, পড়া গেল, শুনোগেল, ও কি হচ্ছে সকালবেলা?

পটল মৃদু প্রতিবাদের নাকিসুরে বললে—সকালবেলাবুঝি? এখন তো দুপুর হয়ে এল—

—না, তা হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে থাকে নারাতদিন।

—ছাগল যে বেগুন গাছ খেয়ে যাচ্ছে?

—যাক গে খেয়ে।উঠে আয় ওখান থেকে। ব্রাহ্মণেরছেলে হয়ে কি কাপালীর ছেলের মতো দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত?

অনঙ্গবললে—কেন ছেলেটার পেছনে অমন করে লাগছগা। বেড়া বাঁধছে বাঁধুক না, ছুটির দিন তো!

গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বললে—না, ওসব শিক্ষে ভালো না।ব্রাহ্মণের ছেলে, ও রকম কি ভালো?

পটল নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেড়া বাঁধা রেখে উঠেএল।

অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো, একবার হরিহরের হাটেযাও না।

—কেন?

—একবার দেখে এসো নতুন গুড় উঠলো কিনা।

—সে তুমি ভেবো না, আমায় গুড় কিনতে হবে না।এখান থেকেই পাওয়া যাবে। সবাই ভক্তি করে।

বাইরে থেকে কে ডাকলে—চক্কত্তি মশায়, বাড়ি আছেন?

গঙ্গাচরণ বললে—কে রামলাল? দাঁড়াও—

আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই বোঝাযায়। গঙ্গাচরণ বাড়ির বাইরে আসতেই সে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—একবার হাতখানা দেখুন তো?

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—অমন করে হাত দেখে না।বসো, ঠাণ্ডা হও। হেঁটে এসেচ, নাড়ী চঞ্চল হবে যে! বাপু এ কোদাল কোপানো নয়! এসব ডাক্তার-বদ্যির কাজ, বড্ডঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। কাল কেমন ছিলে?

—রাত্রিতে জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর যেন ভারী পাথর—

—কি খেয়েছিলে?

—দুটো ভাত খেয়েছিলাম চক্কত্তি মশাই, আর কি খাবোবলুন, তা ভাত মুখে ভালো লাগলো না।

—যা ভেবেছি তাই। ভাত খেলে কি বলে? জ্বর সারবেকি করে?

—আর খাবো না।

—সে তো বুঝলাম—যা খেয়ে ফেলেচ, তার ঠ্যালা এখনসামলাবে কে? বোসো, দুটো বড়ি নিয়ে যাও—শিউলিপাতাররস আর মধু দিয়ে খেও, দ্যাখো কেমন থাকো—

ওষুধ নিয়ে রামলাল চলে যাচ্ছিল, গঙ্গাচরণ ডেকেবললে—ওহে রামলাল, ভালো কথা, এবার নতুন সর্ষে হয়েছেক্ষেতে? দুকাঠা পাঠিয়ে দিয়ো তো। আমি বাজারের তেলখাইনে বাপু, সর্ষে দিয়ে কলুবাড়ি থেকে ভাঙিয়ে নিই।

—যে আজ্ঞে। আমার ছেলে ও-বেলা দিয়ে যাবে'খন।তেমন সর্ষে এবার হয় নি চক্কত্তি মশাই। বিষ্টি হওয়াতে সর্ষেগাছে পোকা ধরে গেল কার্তিক মাসে।

রামলালকে বিদায় দিয়ে গঙ্গাচরণ সগর্বে স্ত্রীর কাছেবলল—দেখলে তো? যাকে যা বলবো, না বলুক দিকি কেউ? সে জো নেই কারো!

স্বামীগর্বে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।সে আদরের সুরে বললে—এখন নেয়ে নাও দিকি? বেলাতেতপ্পরে হয়েচে। সেই কখন বেরিয়েচ দুটে ছোলা-গুড় মুখেদিয়ে, নাও—এখুনি তো তোমার ছাত্তরের দল আসতে শুরুকরবে! তেল দিই—

নদীতে স্নান সেরে এসে জলখাবার অর্থাৎ ছোলাভিজেও একটুকরো আখের পাটালি খেতে খেতে গঙ্গাচরণেরমুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ, পাঠশালা খোলার কথা কিছু হল বিশ্বেস মশায়ের সঙ্গে?

—সব হয়ে যাবে। ওঁরা নিজেরা ঘর বেঁধে দেবেনবললেন—

—ছেলে হবে কি রকম?

—দুটো গাঁয়ের ছেলেমেয়ে পাচ্চি—তাছাড়া প্রাইবিট পড়ার ছাত্তর তো আছেই হাতে। এ দিগরে লেখাপড়া জানালোক কোথায় পাবে ওরা? সকলের এখন চেষ্টা দাঁড়িয়েচেযাতে আমি থাকি।

—সে তো ভালোই। উড়ে উড়ে বেরিয়ে কি করবে—এখানেই থাকা যাক। আমার বড় পছন্দ হয়েচে। কোনোজিনিসের অভাব নেই। মুখের কথা খসতে যা দেরি—

—রও, সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের। চাষা গাঁ, জিনিস বলো, পত্তর বলো, ডাল বলো, মুলো বেগুনবলো—কোনো জিনিসের অভাব হবে না। এ গাঁয়ে পুরুতনেই, ওরা বলচে, চক্কত্তি মশাই, আমাদের লক্ষ্মীপুজো, মনসা পুজোটাও কেন আপনি করুন না?

—সে বাপু আমার মত নেই।

—কেন—কেন?

—কাপালীদের পুরুতগিরি করবে? শুদ্দুর-যাজক বামুনহলে লোকে বলবে কি?

কে টের পাচ্ছে বলো? এ অজ পাড়াগাঁয়ে কে দেখতেআসচে—তুমিও যেমন।

—কিন্তু ঠাকুরপুজো জানো? না জেনে পুজো-আচ্চাকরা—ওসব কাঁচাখেকো দেবতা, বড্ড ভয় হয়। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করা—

—অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতেআজকাল ষষ্ঠীপুজো মাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হবে।

—তুমি যা বোঝো—

—কোনো ভয় নেই বৌ—তুমি দেখে নিয়ো, এ ব্যাটাদেরসব দিক থেকে বেঁধে ফেললে কোনো ভাবনা হবে না আমাদেরসংসারে।

অনঙ্গও তা জানে। স্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু কথা তা নয়—এক জায়গায় টিকে থাকতেপারলে সব হতে পারে, কিন্তু স্বামীর মন উড়ু-উড়ু, কোনো গাঁয়ে এক বছরের বেশি তো টিকে থাকতে দেখা গেল না।বাসুদেবপুরই বা মন্দ ছিল কি? একটু সুবিধে হয়ে উঠতে নাউঠতে উনি অমনি বললেন—চলো বৌ, এখানে আর মনটিকছে না।

অমন করে উড়ে উড়ে বেড়ালে কি কখনো সংসারেউন্নতি হয়? তবে একথা ঠিক, বাসুদেবপুরে শুধু পাঠশালায়ছেলে পড়ানোতে মাসে আট-দশ টাকা আয় হোত। আরএখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় কত। উন্নতি হয় তো এখানথেকেই হবে। উনি যদি মন বসিয়ে থাকেন তবে সবই হতেপারে সে জানে।

একটু পরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে স্লেট বই নিয়ে দড়িবাঁধা দোয়াত ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের কাছে পড়তে এল।

গঙ্গাচরণ বললে, আমি এই খেয়ে উঠলাম, একটু শুয়ে নিই—তোরা পুরোনো পড়া দ্যাখ ততক্ষণ। ওরে নসু, তোদেরবাড়িতে বেগুন হয়েছে?

একটি ছোট ছেলে বললে—হ্যাঁ গুরুমশায়—

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—গুরুমশায় কি রে? সার্‌বলবি। শিখিয়ে দিইচি না? বল্ —

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে—হ্যাঁ সার্—

—যা গিয়ে বসে লিখগে—বেগুন নিয়ে আসবি কাল, বুঝলি?

—আনবো সার্।

ছেলে কটি দাওয়ায় বসে, এমন চিৎকার জুড়ে দিলে যেতাদের ত্রি-সীমানায় কারো নিদ্রা বা বিশ্রাম সম্পূর্ণ অসম্ভব.অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো তোমার ছাত্তরেরা যে কানের পোকা বের করে দিলে। ওদের একটু থামিয়ে দাও।

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! পড়া থাক এখন, সবাইশটকে কড়াংকে লিখে রাখ সেলেটে। আমি ঘুমিয়ে উঠেদেখবো।

তারপর স্ত্রীকে খুশির সুরে বললে—ছটা হয়েছে, আরো সাত-আটটা কাল আসছে পুবপাড়া থেকে। ভীম ঘোষ বলছিল, বাবাঠাকুর, আমাদের পাড়ার সব ছেলে আপনার কাছেপাঠাবো। নেতা কাপালীর কাছে পড়লে যদি ছেলে মানুষহোত, তা হলে আর ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ হল সমাজের সব কাজের গুরুমশায়। কথায় বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

গঙ্গাচরণ মন দিয়ে ছেলে পড়ায় বটে। ঘুম থেকেউঠে সে ছেলেদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত রইল—কাউকেনামতা পড়ায়, কাউকে ইংরেজি ফার্স্ট বুক পড়ায়—ফঁকিবাজগুরুমশায় কেউ তাকে বলতে পারবে না। বেলা বেশ পড়েগেলে সে ছাত্রদের ছুটি দিয়ে লাঠি নিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করতে অনঙ্গ এসে বললে, ওগো কিছু খেয়ে যাবে না—আজ দু'বাড়ি থেকে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল, একটু ক্ষীরকরেচি...

বৈকালিক জলযোগ অনেকদিন অদৃষ্টে ঘটে নি।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে আজ তিনটি বছর কাটচেস্বামী-স্ত্রীর। সুতরাং স্ত্রীর কথা গঙ্গাচরণের কানে একটু নতুনশোনালো।

স্ত্রীকে বললে—ছেলেদের দিয়েচ?

—সে ভাবনা তো তোমায় করতে হবে না, তুমি খেয়েনাও—

খেতে খেতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে স্ত্রীকে বললে—এখানেআছি ভালোই, কিবল?

অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে সমর্থনসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, সে কোনো উত্তর করল না। লক্ষ্মীর কৃপা যদি হয়ই, মুখে তানিয়ে বড়াই করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী রাগ করেন।

গঙ্গাচরণ খানিকটা ক্ষীরসুদ্ধ বাটিটা স্ত্রীর হাতে নিয়েবললে—এই নাও—

—ও কি! না না—সবটা খেয়ে ফেল—

—তুমি এটুকু—

—আমার জন্যে আছে গোআছে, সে ভাবনা তোমায়করতে হবে না।

—তা হোক। আর খাবো না—এবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ি যাই। পাকাপাকি করে আসি।

—বেশি দেরি কোরো না—এখেনে নাকি বুনো শুওরবেরোয় সন্দের পর। আমার বড্ড ভয় করে বাপু—

গঙ্গাচরণ ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের রাস্তা বেয়েগন্তব্যস্থানে যেতে যেতে কল্পনাচক্ষে তার ভবিষ্যৎ গৃহস্থালির ছবি আঁকছিল। বেশ লাগে ভাবতে। এই সব মাঠে ভালোচাষের জমি পাওয়া যায়। যদি কিছু জমি তাড়ংগাড়ার বাঁড়ুয্যেজমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়ার যোগাযোগ ঘটে, যদি বিশ্বাস মশায়কে বলেকয়ে একখানা লাঙল করা যায় তবেভাত-কাপড়ের ভাবনা দূর হবে সংসারের।

অনেকদিন থেকে সে-জিনিসের ভাবনাটা চলে আসছে।

হয়তো ভগবান ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসে ফেলেচেনএতদিনে।

বিশ্বাস মশায়ও যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন গঙ্গাচরণকেএ-গ্রামে বসাবার জন্য। বললেন—আপনারা আমাদের মাথারমণি—আমি আপনাকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—একটা পাঠশালার বন্দোবস্ত আপনি করে দিন—

—সব হয়ে যাবে—আপাতত যাতে আপনার চলে তারব্যবস্থা করতে হবে তো? বাড়িতে খেতে ক'জন?

—আমার স্ত্রী ও দুটি ছেলে

বিশ্বাস মশায় মনে মনে হিসেব করে বললেন—ধরুন মাসে দশ আড়ি ধান-পনেরো কাঠা চাল হলে আপনার মাসচলে যাবে—কি বলেন?

—হ্যাঁ, তাই ধরুন—

—আর সংসারের ডালডুল, তেল-নুনও হয়ে যাবে।পুরুতগিরিটাও ধরুন—

—সে তো ঠিক করেই রেখেচি—সংস্কৃত জিনিসটা কষ্টকরে শিখতে হয়েছে—ও বড় শক্ত জিনিস, সকলের মুখ দিয়ে কি বেরোয় ? এই শুনুন তবে—ধ্যায়ন্নিত্যং রজত গিরিনিভংচারুচন্দ্রাবতংসং—ইয়ে পরশুমৃগবরা ভীতিহন্তা—ইয়েরত্নকল্পজ্জ্বলাং

—বাঃ, বাঃ

—এটা কি বলুন তো?

—কি করে জানবো বলুন—আমরা হচ্ছি চাষিবাসীগেরস্ত, আংক আস্ক পর্যন্ত আমাদের বিদ্যে। আর শিশুবোধক—পড়েছেন শিশুবোধক?

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল—

দেখুন কদ্দিন আগে পড়েচি, ভুলি নি। সব মনে আছে।

গঙ্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে— বেশ—বেশ—

বিশ্বাস মশায় হৃষ্টমনে বললেন—বাবা মারা গেলেন অল্প বয়সে। সংসারে দুটি নাবালক ভাই—জমিজমা যা ছিল এক জ্ঞাতি খুড়ো সব নিজের বলে লিখিয়ে নিলে জরিপের সময়—

—সে কোথায়?

—চিত্রাঙ্গপুর, ডাবতলীর কাছে। ডাবতলীর গরুর হাট ও-দিগরে নামকরা। অত বড় গরুর হাট জেলায় নেই।

—সেখান থেকে বুঝি এখানে এলেন?

—হ্যাঁ, দেখলাম ও গাঁয়ে আর সুবিধে হবে না। মনে মনে বললাম, মন, পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়। এখানে কি না খেয়েমরবো? আমি আর বিষ্টু সা—বিষ্টু সা আমার ছেলেবেলাকারবন্ধু। আমার সঙ্গে গাঁ ছেড়ে যেতে রাজী হল। তখন খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। এ বলে এখানে জমি সস্তা, ও বলে ওখানে জমি সস্তা। কিন্তু মশায় জমি পাওয়াই যায় না। সস্তা তো কোথাও দেখলাম না। পঞ্চাশ টাকার কমে কোথাও জমিনেই—

—ধানের জমি—

বিশ্বাস মশায়ের অন্দরমহলে এই সময় শাঁকে ফুপড়লো, গঙ্গাচরণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—ও, সন্দে হয়ে গেল—আমি এবার যাই—এবার সন্দে-আহ্নিক করতেহবে কিনা?

আসল কথা, স্ত্রীর বুনো শুওর সংক্রান্ত সতর্কবাণীতার মনে পড়েছে। নতুন গাঁয়ের আশেপাশে এখনো যথেষ্টবনজঙ্গল, অন্ধকারে চলাফেরা না করাই ভালো। সাবধানেরমার নেই।

বিশ্বাস মশায় বললেন—তা বিলক্ষণ, এখানে আমার এই বাইরের ঘরেই সন্দে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই। গঙ্গাজল আছে বাড়িতে। আমরা জেতে কাপালী বটে, কিন্তু আমাদেরবাড়ির মেয়েরা স্নান না করে মুখে জলটুকু দেয় না—সবমাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের সন্দে-আহ্নিক হলে এ বাড়িতে, বাড়ি আমার পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর একটু জলমুখে দিন—

—না, না, সে সবে এখন আর দরকার নেই—যখনএখানে আছি, তখন সবই হবে—উঠি এখন-গঙ্গাচরণ খুবব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—আমার গল্পটা শুনে যান।তারপর তো—

—আচ্ছা ও আর একদিন শুনবো এখন। সন্দে-আহ্নিকেরসময় হয়ে গেলে আমার আর কোনোদিকে মন থাকে না।ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত পড়িচি—নিত্যকর্মগুলো তো ছাড়তেপারবো না—

গঙ্গাচরণের কণ্ঠস্বর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলো।

গঙ্গাচরণের পাঠশালা বেশ জমে উঠেছে।

আজ সকালে সাত-আটটি নতুন ছাত্র দড়ি-বাঁধা মাটিরদোয়াত হাতে ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত। গঙ্গাচরণ তাদের নিয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই স্থূলবুদ্ধি, ওদের বাপ-ঠাকুরদাদা কখনো নিজের নাম লিখতে শেখেনি, জমি চষে কলা বেগুন করে জীবিকানির্বাহ করে এসেছে, লেখাপড়া শেখাটা এদের বংশে একেবারে অভিনব পদার্থ।

গঙ্গাচরণ বললে, সকাল থেকে চেষ্টা করে ক'এর আঁকুড়ি দিতে শিখলি নে? তা শিখবি কোথা থেকে? এখন ওসব আঙুল সোজা হতে ছমাস কেটে যাবে। লাঙলের মুঠি ধরেধরে আড়ষ্ট হয়ে আছে যে! এই ভুতো, যা একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় দিকি। রান্নাঘরে তোর কাকিমার কাছ থেকেআগুন নিয়ে আয়—

দুটি ছাত্র ছুটলো তখুনি আগুন আনতে।

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! যাবার দরকার কিতোমার?—ভুতো একাই পারবে।

অন্য একটি ছেলের দিকে চেয়ে বললে—তোর বাবাবাড়ি আছে?

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ সার্—

—কাল যেন আমায় এসে কামিয়ে যায় বলে দিস্—

—সার্, বাবা কাল ভিনগাঁয়ে কামাতে গিয়েছে।

—এলে বলে দিস, এখানে যেন আসে।

অনঙ্গ-বৌ ডেকে পাঠালে বাড়ির মধ্যে থেকে।গঙ্গাচরণ গিয়ে বললে—ডাকছিলে কেন?

অনঙ্গ বললে—শুধু ছেলেদের নিয়ে বসে থাকলেচলবে? কাঠ ফুরিয়েছে, তার ব্যবস্থা দ্যাখো—

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হবার সুরে বললে—সে কি? এই যে সেদিন কাঠ কাটিয়ে দিলাম এক-গাড়ি! সব পুড়িয়ে ফেললেএর মধ্যে?

অনঙ্গ রাগ করে বললে—কাঠ কি খাবার জিনিস যেখেয়ে ফেলেচি? রোজ এক হাড়ি ধান সেদ্দ হবে, চিঁড়ে কোটাহল দশ-বারো কাঠা—এতে কাঠ খরচ হয় না?

অনঙ্গ কথাটা একটু গর্ব ও আনন্দের সুরেই বলল, কারণসে যে দরিদ্র ঘর থেকে এসেছে, সেখানে একদিনে এত ধানেরচিঁড়েকোটারূপ সচ্ছলতা স্বপ্নের বিষয় ছিল—যে দারিদ্র্যেরমধ্যে এসে পড়েছিল প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসে, এখন সে-কথাভাবতে যেন পারা যায় না।

বাসুদেবপুর এসে আগের চেয়ে অবিশ্যি অবস্থা ভালোইহয়েছিল। তবে সে গ্রামে শুধু পাঠশালার ছেলে পড়ানোরআয় ছিল সম্বল, জিনিসপত্র কেউ দিত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেএখনো বাসুদেবপুর নিয়ে কথা ওঠে।

সেদিনই দুপুরের পর আহারান্তে গঙ্গাচরণ একটু বিশ্রামকরছিল, অনঙ্গ এসে বললে—বাসুদেবপুর আবার যাবার ইচ্ছেআছে?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—কেন বল দিকি?

—না, তাই বলছি। সেখানকার ঘরখানা তো এখনো রেখেই দিয়েচ, বিক্রি করেও তো এলে না!

—তখন কি জানি এখানে বেশ জমে উঠবে?

—ভাতছালার জন্যে কিন্তু মন কেমন করে। সেখানকার পদ্মবিলের কথা মনে আছে?

—পদ্মবিল তো ভালোই ছিল। বেশ জল।

—চত্তির মাসে জল থাকতো না বটে, কিন্তু না থাকুক বাপু, গাঁখানার লোকগুলো ছিল বড্ড ভালো। তিনদিকে মাঠ,একদিকে অতবড় বিল, সুন্দর দেখতে ছিল।

—তুমি তো বলেছিলে পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবে!

—ভেবেছিলাম নতুন খড় উঠলেই পদ্মবিলের ধারে ঘরতৈরি করবো। লোকজনকে বলেও রেখেছিলাম। সস্তায় খড়দিত।

অনঙ্গ আপনমনে হিসেব করবার ভঙ্গিতে বললে আঙুলগুনে গুনে—হরিহরপুরে বিয়ে হল, সেখান থেকে ভাতছালা, তারপর বাসুদেবপুর, তারপর এখানে। অনেক দেশ বেড়ানো হল আমাদের—কি বলো?

গঙ্গাচরণ গর্বের সুরে বললে-বলি হরিহরপুর গাঁয়েরক’জন এত দেশ দেখে বেড়িয়েছে?

অনঙ্গ বললে—শুধু দেখে বেড়ানো কি বলো গো! বাসওকরা হয়েচে।

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু একটা কথা বাপু..

—কি?

—এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও আর যেয়ো না।

—যদ্দিন চলা-চলতির সুবিধে থাকে, থাকবো বৈকি। এখন তো বেশই হচ্ছে—বিশ্বাস মশায় এ গাঁয়ের মোড়ল। সে যখন ভরসা দিয়েচে, তখন আর ভয় করিনে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার যে মন টেকে না কোথাও বেশিদিন!

—হাতে পয়সা এলেই মন টিকবে। তা ছাড়া দিব্যি নদী—

—আমার কিন্তু ইচ্ছে করে একবার ভাতছালা দেখতে।

—তা একবার গেলেই হয়। গরুর গাড়িতে একদিনেররাস্তা। বিশ্বেস মশায়ের কাছে বললেই গরুর গাড়ি দিতে পারে।

অনঙ্গ আগ্রহের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ গা তা বলো না।বলবে একবার বিশ্বেস মশায়কে?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কেন? ভাতছালা যাবার খুবইচ্ছে?

—খু-উ-ব।

—তুমি তাহলে পটল আর খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো একদিন।

—কেন তুমি?

—আমার পাঠশালার ছুটি কই? আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

—কতকাল যাই নি ভাতছালা। চার বছর কি পাঁচ বছর। ভাতছালার বিনি নাপতিনীকে মনে আছে? আহা, কি ভালোইবাসতো। আবার দেখা হলে সেও কতখুশি হয়। সেই—সেই আমবাগানের ধারে আমাদের ঘরখানা—আচ্ছা কত জায়গায়ঘর বাঁধলে বলো তো?

গল্পগুজবে শীতের বেলা পড়ে এল। গঙ্গাচরণ উঠে বললে—যাই। একবার পাশের গাঁয়ে যাবো। পাঠশালার জন্যেআরো ছাত্র যোগাড় করে আনি। ছাত্র যত বেশি হবে ততইসুবিধে।

—একটু কিছু জল খেয়ে যাও

গঙ্গাচরণ আহ্লাদে হেসে বললে—অভ্যেস খারাপ করে দিয়ো না বলছি। এ সময় জলখাবার খেয়েছি কবে?

অনঙ্গ হাসিমুখে বললে—মা লক্ষ্মী যখন জুটিয়েদিয়েছেন, তখন খাও। দাঁড়াও আমি আনি—

একটা পাথরের বাটিতে কয়েক টুকরো পেঁপে কাটা ওআখের টিক্‌লি এবং অন্য একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা সর নিয়ে অনঙ্গ-বৌ স্বামীর সামনে রাখলে। গঙ্গাচরণ খেতেখেতে বললে—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?

—কি?

—আচ্ছা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে হয় না?

অনঙ্গ ঠোট উল্টে বললে—ওঃ, তোমার যদি হল তোসব চাই! চা!

—কেন? —ওসব বড়মানুষে খায়। গরিবের ঘরে কি পোষায়?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আসলে তুমি চা তৈরি করতেজান না তাই বলো।

অনঙ্গ মুখভঙ্গি করে বললে—আহা-হা!

—পারো চা করতে? কোথায় করলে তুমি?

অনঙ্গ এক ধরনের হাসলে, যার মানে হচ্ছে, আর ভানকরে কি করবো?

গঙ্গাচরণ বললে—কেমন, ধরে ফেলেচি কি না?

অনঙ্গ প্রত্যুত্তরে আর একবার হেসে বললে—না করি, করতে দেখেছি তো! বাসুদেবপুরে চক্কতি-বাড়ি চা খেতোসবাই। আমি গিন্নির কাছে বসে বসে দেখতাম না বুঝি?

গঙ্গাচরণ পাশের গ্রামে যখন মাঠের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে। সারাদিনের তাজা খর রোদে উলু ও কাশবনে কেমন সুন্দর একটা সোঁদা গন্ধ। শীতওআজ পড়েছে মন্দ নয়।

একটা লোক খেজুর গাছে মাটির ভাড় নিয়ে উঠচে দেখেগঙ্গাচরণ ডেকে বললে—বলি ও ছিদাম, একদিন খেজুর-রসখাওয়াও বাবা।

নোকটা গাছের ওপর থেকেই বললে—গুরুমশায়? কাল সকালে পেটিয়ে দেবেন একটা ছেলে। এক ভাঁড় যেন নিয়েযায়—

গঙ্গাচরণের মনে যথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ এই ভেবেযে, কেউ তার কথা এখানে ঠেলতে পারে না। সবাই মানে, যার কাছে যে জিনিস চাওয়া যায়, কেউ দিতে অস্বীকার করেনা। বাসুদেবপুরে এমন ছিল না, ভাতছালাতেও না।

পাশের গ্রামের কোনো নাম নেই-‘পশ্চিমপাড়া’ বলেসবাই। এর একটা কারণ—এসব গ্রাম আজ কয়েক বৎসরহল বসেচে। আগে এসব পতিত মাঠ বা অনাবাদী চর ছিল, এদেশের চাষাদের জমির অভাব ছিল না, তাদের মধ্যে কেউএসে সব জঙ্গল ও নলখাগড়া ভরা পতিত জমিতে চাষ করতেরাজী নয়। অন্য জেলা থেকে কাপালী জাতীয় চাষিরা এসেএই অনাবাদী চরে সোনা ফলিয়েছে, এরাই নতুন গ্রামগুলোবসিয়েছে—গ্রামের নামকরণ এখনো হয় নি।

পশ্চিমপাড়াতে ঢুকেই গ্রামের মণ্ডপ ঘর। বিকেলেদু-পাঁচজন লোক এখানে বসে তামাক পোড়াচ্চে।

একজন গঙ্গাচরণকে দেখে বললে—কি মনে করেদাদাঠাকুর? পেরনাম হই। আসুন—

গঙ্গাচরণ ভড়ং দেখাবার জন্যে ফতুয়ার নিচে থেকেপৈতেটা বার করে আঙুলে জড়িয়ে হাত তুলে বললে—জয়স্তু!

তারপর বসে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে— এটা বেশ ঘরখানা করছে তো? পুজো হয়?

দলের মধ্যে একজন গঙ্গাচরণকে তামাক খাওয়াবারজন্যে কলাপাত আনতে ছুটলো। একজন বললে—পুজো হয়নি দাদাঠাকুর। সামনের বারে করবার ইচ্ছে আছে—আচ্ছা, আপনি পারবেন দাদাঠাকুর?

গঙ্গাচরণ অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসেচুপ করে রইল, উত্তরদিলে না। ওতে পসার থাকে না।

ওদের মধ্যে আর একজন পূর্বের লোকটিকে ধমক দিয়ে বললে—জানিস নে শুনিস নে কথা বলতে যাস—ওই তো তোর দোষ! উনি জানেন না পুজো কত্তি তো কে করবে? উনি নেকাপড়া জানা পণ্ডিত মানুষ।

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—থাক থাক, ও ছেলেমানুষ...বলেচে বলেচে—

ইতিমধ্যে কলার পাত এল, একজন হুঁকো থেকে কল্কে খুলে গঙ্গাচরণের হাতে দিতে যেতেই গঙ্গাচরণ বিস্মিতভাবেবললে—কি?

—তামাক ইচ্ছে করুন—

—তোমাদের উচ্ছিষ্ট কল্কেতে আমি তামাক খাবো?

দলের যে লোকটি কল্কে এগিয়ে হাতে দিতে গিয়েছিল, সে দস্তুরমতো অপ্রতিভ হল।

তখন ওদের মধ্যে সেই বিজ্ঞ লোকটি আবার ধমক দিয়ে বললে—এ কি পাঁচুঠাকুরকে পেয়েছিস তোরা, কাকেকি বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়ান দাদাঠাকুর, আমার বাড়িতেনতুন কলকে আড়ায় টাঙানো আছে, নিয়ে আসি।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—হাত ধুয়ে এনো—

উপস্থিত লোকগুলি ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লো। হাতধুয়ে নতুন কল্কেতে তামাক সাজতে হয় যার জন্যে, এমনব্রাহ্মণ সত্যি কথা বলতে গেলে তারা কখনো দেখে নি।

নতুন কল্কে আনীত হল, নতুন কলাপাতাও। গঙ্গাচরণেরহাতে ভক্তিভাবে টাটকা-সাজা তামাক এগিয়ে দেওয়া হল।

গঙ্গাচরণ বললে—কথাবার্তা বলতে হয় বুঝে-সুজেবাপু। আমি পুজো করতে জানি না-জানি তোমরা যে জিজ্ঞেসকরলে—তোমরা এর কিছু বুঝবে?

বিজ্ঞ লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, হুঁ একদম অর্গমুখ্যু !

এই কথা বলে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করে সে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাদ দিন ওদের কথা। ওরা কাকে কিবলতে হয় জানে?

গঙ্গাচরণ বললে—সে কথা যাক গে। এখন তোমাদেরএখানে আসার উদ্দেশ্য কি জানো?

দলের অন্য লোকেরা কথা বলতে সাহস না করতেশুধু বিজ্ঞ লোকটিই এর উত্তরে বললে—কি বলুন দাদাঠাকুর?

—আমি একটা পাঠশালা খুলেচি নতুন গ্রামে। তোমাদের গ্রামের ছেলেগুলি সেখানে পাঠাতে হবে।

—বেশ কথা দাদাঠাকুর। এ তো খুব ভালো। আমাদের ছেলেপিলেদের একটা হিল্লে হয় তা হলে—

—খুব ভালো। সেজন্য তো আমি এলাম তোমাদেরকাছে। তুমি একবার সবাইকে বলো—

লোকটি দলের দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো সবাই দাদাঠাকুর যা বললেন? আপনি বসুন, আমি ওদের ডেকে নিয়ে একটু পরামর্শ করি—

একটা কাঁটালতলায় সকলে মিলে জোট পাকিয়ে কিবলা-কওয়া করলে, তারপর বিজ্ঞ লোকটি আবার ফিরে এসে গঙ্গাচরণের কাছে বসলো। বললে—সব ঠিক হয়ে গেলদাদাঠাকুর—

—কি?

—সবাই ছেলে পেটিয়ে দেবে কাল থেকে। ওনারা আরএকটা কথা বলচেন—

—কি কথা?

—আমাদের এখেনে যদি পাঠশালা খোলেন তবে কেমনহয়?

—দু’জায়গায় হয় না। ও গ্রামে বাস করি, এ গ্রামেপাঠশালা—তাও হয় না।

—কত দিতে হবে আমাদের, একটা ঠিক করে দ্যান্—

—আমার বাপু জোরজবরদস্তি নেই, বিদ্যাদানং মহাপুণ্যং, বিদ্যাদান করলে কোটি অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তবে আমারও তো চলা-চলতির ব্যবস্থা একটা চাই, এই বুঝে তোমরা যা দাও। নিজেরাই ঠিক করো। আমার মুখে বলাটাভালো হবে না।

গঙ্গাচরণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এভাবে অগ্রসর হলে ফল ভালো হয় সে জানে। কাজেই বাড়িতে ফিরে অনঙ্গ যখন বললে—তা ওদের ওপর ফেলে দিলে কেন? তোমার নিজের বলা উচিতছিল—তখন গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আরে না জেনে কি আরআমি তাড়ু ঘাঁটতে গিয়েছি! আমি নিজের মুখে হয়তো বলতামচার আনা—ওরা দেবে আট আনা দেখে নিয়ো তুমি।

পরদিন সকালে খোদ বিশ্বাস মশায়কে নিজের বাড়িতে আসতে দেখে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হল। ছেলেকে ডেকেবললে—পটলা, ডেক্‌সোটা নিয়ে আয় চট করে—

বিশ্বাস মশায় বললেন—থাক থাক—আমার জন্যেকেন—

—সে কি হয়? বসুন বসুন—তারপর কি মনে করেসকালবেলা?

—একটা কথা ছিল। আমার বাড়িতে কাল আপনিসমস্কৃতে বলেছেন, বাড়ির মেয়েরা সব শুনেচে। আমারএকটা গাইগরুর আজ মাসাবধি হল দড়ি গলায় আটকে অপমিত্যু ঘটেছে। সবারই মন সেজন্যে খারাপ। আমারনাতির অসুখ সেই থেকে সারচে না—জ্বর আর সর্দি লেগেইআছে—বুঝলেন?

গঙ্গাচরণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো।ভাবটা এই রকম যে, “ও তো না হয়েই যায় না”—

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন কি করা যায়? কালরাত্তিরে আমার পরিবার বললে—ওনার কাছে যাও, উনি পণ্ডিত লোক, একটা হিল্লে হবে।

গঙ্গাচরণ পূর্ব্ববৎ চিন্তাকুল। সংক্ষেপে শুধু বললে—হুঁ—

ওর হাবভাব দেখে বিশ্বাস মশায় ভয় পেয়ে গেলেন।খুব গুরুতর কিছু ঘটবার সূত্রপাত নাকি তাঁর সংসারে? শাস্ত্রজানা ব্রাহ্মণ, কি বুঝেছে কি জানি? আর কিছু বলতে তারসাহস যোগাল না।

গঙ্গাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিছু খরচকরতে হবে। বিপদে ফেলেচে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বেগের সুরে বললেন—কি রকম? কিরকম?

—গোবধ মহাপাপ। এত বড় মহাপাপ যে—

বিশ্বাস মশায় বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু এ তো আমরাইচ্ছে করে করি নি? মাঠে বাঁধা ছিল, দড়ি গলায় কি করেআটকে—

—ওই একই কথা। গোবধ ওকেই বলে—মহাপাপ।—এখন কি করা যায় তা হলে?

—স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, সামনের আমাবস্যের দিনযোগাড় করতে হবে সব। টাকা-পনেরো-কুড়ি খরচ হবে।

বিশ্বাস মশায়উদ্বিগ্ন সুরে বললেন—কি কি লাগবে একটা ফর্দ করে দিন না ঠাকুর মশাই।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—দেখে শুনে ফর্দ করতেহবে। একটা গুরুতর ব্যাপার, আপনার নাতির অসুখ সারানা-সারা এর ওপর নির্ভর করচে। যা-তা করে দিলেই তো হবে না? দাঁড়ান একটু, আসচি—

গঙ্গাচরণ বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দেখলে অনঙ্গ-বৌ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা সব আড়াল থেকেশুনেচে।

স্বামীকে দেখে বললে—ও কে গা? কি হয়েছে?

গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে ভেতরের উঠোনে ডেকে নিয়ে বলল—বড় খদ্দের। উনি হলেন বিশ্বাস মশায়। তোমারকাপড় আছে ক'খানা?

—আমার?

—আঃ তাড়াতাড়ি বল না! তোমার না তো কি আমার?

—আমার আটপৌরে শাড়ি আছে দু'খানা, আরএকখানা—তিনখানা তোরঙ্গের মধ্যে ভোলা, ভালো শাড়িআছে দু'খানা।

—কি নেবে বলো? ভালো শাড়ি না আটপৌরে?

—ভালো শাড়ি একখানা হলে বড় ভালো হয়, কস্তাপেড়ে, এই—এই রকম জলচুরি দেওয়া, বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-গিন্নির পরনে দেখে সেই পর্যন্ত বড্ড মনটার ইচ্ছে—হ্যাঁগা, কে দেবে গা?

—আঃ, একটু আস্তে কথা বলতে পারো না ছাই? দাঁড়িয়েরয়েছে বাইরে। আর শোনো, গাওয়া ঘি আছে ঘরে?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে— গাওয়া ঘি? বলে ভাত পায় না, মুড়কি জলপান—

গঙ্গাচরণ বাইরে এসে বললে—এই যে বিশ্বাস মশায়, বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু এসব কাজ ভেবেচিন্তে করে দিতে হয়।শুনে নিন, ভালো লালপাড় শাড়ি একখানা, গাওয়া ঘি আধসের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন, চিনি পাঁচপোয়া, পাকাকলা একছড়া, সন্দেশ পাঁচপোয়া, গামছা দুখানা, পেতলের থালা একখানা, ঘটি একটা, ধুনো একপোয়া...ওঃ ভুলে গিয়েছি, মধুপর্কের বাটি একটা, আসন একটা—

বিশ্বাস মশায় মন দিয়ে ফর্দ শুনে বললেন—আর সব নতুন দেবো, কিন্তু ও থালাঘটি কিনতুনই দিতে হবে? আপনারবাড়ি থেকে না হয় দিন, কিছু দাম ধরে দিলে হয় না?

—তা হয়। তবে খুঁৎ না রাখাই ভালো। আপনি নতুনইদেবেন।

—দিন ঠিক করে দিন—

সামনের আমাবস্যায় হবে, ও আর দিন ঠিক কি। বলেছিতো। দক্ষিণে লাগবে দু'টাকা।

বিশ্বাস মশায় অনুরোধের সুরে বললেন—টাকা খরচেরজন্যে আপত্তি নেই—যাতে নাতিটি আমার—ঠাকুর মশাই—যাতে সেরে ওঠে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন উনি।

গঙ্গাচরণ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললে—হুঁ, গোবধ! বলেকত কত শক্ত কাণ্ডের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে এলাম।কোনো ভয় নেই, যান আপনি।

অনঙ্গ স্বামীর কৃতিত্বে খুশি না হয়ে পারলো না যেদিন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মশায়ের বাড়ি থেকে একরাশি জিনিসপত্রবহন করে বাড়ি নিয়ে এল। একগাল হেসে বললে—দেখিশাড়িখানা? বাঃ চমৎকার কস্তাপেড়ে—গাওয়া ঘি? কতটা?

—তা আছে পাকি তিনপোয়া। বাড়ির তৈরি খাঁটি ঘি।

—এইবার একবার ভাতছালা বেড়িয়ে আসি, কি বলো?

—বিশ্বেস মশায়কে বলেও এসেছি। গরুর গাড়ি দেবেবলেচে—

—তুমি যাবে না? আমার কি সময় আছে যে যাবো? ছেলে পড়াতেহবে না? তুমি যাও ছেলেদের নিয়ে। এসময়ে টাকাও পেয়েছি দুটো। একটা থাক, একটা খরচ করে এসো।

কিন্তু যাই যাই করে শীত কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাসপড়ে গেল। তখন অনঙ্গ একদিন বিশ্বাস মশায়ের গরুরগাড়িতে ছেলেদের নিয়ে ভাতছালা রওনা হল। দু'ক্রোশ পথ গিয়ে কাটালিয়া নদী পার হতে হল জোড়া খেয়ানৌকাতেগরুরগাড়িসুদ্ধ।অনঙ্গ-বৌয়ের বেশ মজা লাগলো এমনভাবেনদী পার হতে। ওপারে উঁচু ডাঙায় নদীতীরে প্রথম বসন্তেবিস্তর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, বাতাসে ভুর ভুর করচে আমেরবউলের মিষ্ট সুবাস, আঁকাবাঁকা শিমুলগাছে রাঙাফুল ফুটে আছে।

অনঙ্গ ছেলেদের বললে—এখানে এই ছায়ায় বসে দুটোমুড়ি খেয়ে নে—কখন ভাতছালা পৌঁছবি তার ঠিক নেই।

বড়ছেলেটা বললে—ওঃ, কি আমের বোল হয়েছেদ্যাখো সব গাছে। এবার বড্ড আম হবে, না মা?

—খেয়ে নে মুড়ি। আমের বোল দেখবার সময় নেইএখন।

ছেলে দুটি ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগলো নদীরপাড়ে গাছপালার ছায়ায় ফড়িং ধরবার জন্যে। অনঙ্গ ওদেরবকে-ঝকে আবার গাড়িতে ওঠালে।

নিস্তব্ধ ফাগুন দুপুরে মেঠোপথে আমবন, জাম, বট, বাঁশ, শিমুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে বসেঅনঙ্গ-বৌয়ের ঝিমুনি ধরলো। বড়ছেলে বললে—মা, তুমিঢুলে পড়ে যাচ্চ যে, উঠে বোসো!

অনঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে বললে—চোখে একটু জল দিলেহোত। ঘুম আসছে।

ভাতছালা পৌঁছুতে বেলা পড়ে গেল। গাড়োয়ান বললে—তবু সকালে সকালে এসে গ্যালাম মা-ঠাক্‌রোণ।ন'কোশ রাস্তা আমাদের গাঁ থে। গরুদুটোর সুধার বয়েস তাইআসতে পারলে।

ভাতছালাতে অনঙ্গ-বৌয়ের ঘর ছিল গ্রামের বাগ্‌দিপাড়াথেকে অল্পদূরে খুব বড় একটা বিলের কাছে। একখানা খড়েরঘর, সঙ্গে ছোট একখানা রান্নাঘর, অনেকদিন কেউ না থাকাতে চালার খড় কিছু কিছু উড়ে পড়েছে, মাটির দাওয়াতে ছাগলগরু উঠে খুঁড়ে ফেলেচে। উঠোনের চারিধারে বাঁশের বেড়াদেওয়া ছিল, ফাঁকে ফাঁকে রাংচিতার গাছ। বেড়ার শুকনোবাঁশ লোকে ভেঙে নিয়েছে অনেক।

মতি বাগ্‌দিনী ছুটে এল ওদের গরুর গাড়ি দেখে।মহাখুশির সঙ্গে বললে—বামুন-দিদি আলেন নাকি? ওমা, আমাদের কি ভাগ্যি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—আয় আয় ও মতি, ভালো আছিস?

—দাঁড়ান, আগে একটু গড় করে নিই। পায়ের ধুলোদ্যান এটু—খোকারা বেশ বড় হয়েছে দেখচি। বাঃ

—ভালো ছিলি?

—আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে। এখন আছেনকোথায়?

—ওই নতুনগাঁ, কাপালীপাড়ায়। ন'কোশ রাস্তা এখানথেকে।

—এখানে এখন থাকবেন তো?

—বেশিদিন কি থাকতে পারি? সেখানে উনি ইস্কুলখুলেচেন মস্তবড়। এক-ঘর ছাত্তর। দুদিন থাকবো তাই তাঁকেরেঁধে খেতে হবে।

—খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবো?

—আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে পুঁটুলিতে। তুই দুটোশুকনো কাঠ কুড়িয়ে দিয়ে যা।

পদ্মবিলের থেকে কিছু দূরে মুচিপাড়া। প্রায় একশো ঘরমুচির বাস। পদ্মবিলে মাছ ধরে আশেপাশের গ্রামে বেচে এরাজীবিকা-নির্বাহ করে। পোয়াটাক পথ দূরে গ্রামের অন্য অন্যজাত বাস করে। ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামেও নেই—এর একটাপ্রধান কারণ, গঙ্গাচরণ এমন গ্রামে বাস করে নি যেখানেব্রাহ্মণের বাস আছে। কারণ সে গ্রামে তার পসার থাকবে না।তার বদলে অন্য ব্রাহ্মণ যেখানে ডাকবার সুবিধে আছে, এমনগ্রামে সে ঘর বাঁধতে যাবে কি জন্যে? তাতে আদর হয় না।

অনঙ্গ-বৌয়ের আগমনের সংবাদে গোয়ালাপাড়া থেকেবৌ-ঝিয়েরা দেখা করতে এল। কেউ নিয়ে এল একটি ঘটিতেসেরখানেক দুধ, কেউ নিয়ে এল খানিকটা খেজুর-গুড়েরপাটালি, কেউ একছড়া পাকা মর্তমান কলা। অনেক রাতপর্যন্ত ঝি-বৌয়েরা দাওয়ায় বসে গল্প করলে। সকলেই মহাখুশিঅনঙ্গ-বৌ আসাতে। সকলেই অনুরোধ জানালে এখানেকিছুদিন থাকতে। এখানে আবার উঠে এলে কেমন হয়? তারা সব সুবিধে করে দেবে বসবাসের। কোনো অভাব-অভিযোগথাকতে দেবে না। আসুন নাবামুনদিদি তাদের গাঁয়ে আবার?

ওরা নিজেরাই ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে।মাটির প্রদীপে সলতে দিয়ে আলো জ্বেলে দিলে।

মতি মুচিনী বললে—রাত্তিরে আমি এসে শোবো ঘরেরদাওয়ায়। দুটো খেয়ে আসি—

অনঙ্গ-বৌ তাকে বাড়ি গিয়ে খেতে দিলে না। যা রান্না হয়, এখানেই দুটো ভাত খেয়ে নিলেই হবে। গরুর গাড়িরগাড়োয়ানও তো খাবে।

সন্ধ্যার পরে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে জোর দক্ষিণ বাতাসে। বৌ-ঝিয়েরা একে একে চলে গেল।মতি মুচিনী কলার পাত কেটে এনে বিলের ধারে ঘাসেরউপর ভাত খেতে বসলো। গাড়োয়ান বললে—তার শরীর খারাপ হয়েছে, সে কিছু খাবে না রাত্রে।

অনঙ্গ মাদুর পেতে গল্প করতে বসলো বিলের দিকেরজ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায়। শ্যামাচরণ ঘোষের বিধবা মেয়েএকটা কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে এসে হাজির হল অনেক রাত্রে। সেও রাত্রে এখানে শোবে। অনঙ্গ-বৌকে সেও বড় ভালোবাসে। এ মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল পাশের গ্রামে কুমুরে। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, এখন প্রায়সাতাশ-আটাশ বছর বয়েস, দেখতে এখনো সুন্দরী, টকটকেফর্সা রং, মুখশ্রীও ভালো।

অনঙ্গ হেসে বললে—আয় কালী, চাঁদনী রাতে আবারএকটা টেমি কেন ?

কালী আঁচল দিয়ে টেমিটা বাঁচিয়ে আনচে পদ্মবিলেরজোর দক্ষিণ হাওয়া থেকে। বললে—সেজন্যে নয় দিদি, ওইমুচিপাড়ার বাঁশবাগান দিয়ে আসতে গা ছমছম করে এতরাত্তিরে।

—কেন রে ?ভূতে তোর ঘাড় মটকাবে ?

কালী হেসে বললে—ওসব নাম কোরো না রাত্তিরবেলা।তুমি ডাকাত মেয়েমানুষ বাবা—

—দূর পোড়ারমুখী, ব্রাহ্মণের আবার ভয় কি রে ?

—ভূতে বামুন-বোষ্টম মানে না বৌদি, সত্যি কথা বলছি।সেবার হল কি—

মতি মুচিনী ভয়ে পেয়ে বললে—বাদ দেও, ওসব গল্প এখন করে না। এই খেজুরের চটখানা পেতে শুয়ে পড়বামুন-দিদির পাশে।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনে আজ খুব আনন্দ। অনেকদিন পরে সে তার পুরোনো ঘরে ফিরে এসেছে। আবার পুরোনোসঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা হয়েচে। পদ্মবিলের ওপর এমনজ্যোৎস্নারাত্রি কতকাল সে দেখে নি। অথচ এখানে যখন ছিল, তখন কোনোদিন খাওয়া জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। এই মতি মুচিনী কত পাকা আম কুড়িয়ে এনে দিয়েছে, লোকের গাছের পাকা কাঁটাল চুরি করে পর্যন্ত এনে খাইয়েছে।এই কালী গোয়ালিনী বাড়ি থেকে ভাই-বৌকে লুকিয়ে নতুনধানের চিঁড়ে এনে দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ বিলের জলের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে—মনে আছে কালী, সেই একদিন লক্ষ্মীপুজোর রাতের কথা ?

কালী মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বামুনের মেয়েকে খাবারযোগাড় করে দিয়েচে একদিন, তা কি সে এখন মুখে বলবে ?

—মনে নেই ?

—ও কথা ছেড়ে দাও বৌদিদি।

—তুই সেদিন চিঁড়ে না আনলে উপোস দিতে হোত।

—আবার ও কথা ?ছিঃ—

অনঙ্গ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই পদ্মবিলের ওখানটাতে একটা শোল মাছ ধরেছিলাম, মনে আছে মতি?

মতি বললে—গামছা দিয়ে। ওমা, সেদিনের কথা যে। খুব মনে আছে—তুমি আর আমি নাইতি গিয়েছিলাম—

—মস্ত বড় মাছটা ছিল—না রে ?

—ভালো কথা মনে হল। কাল মনে করে দিয়ো দিকিনি।দেওর মাছ ধরবে কাল, একটা বান মাছ কাল খাওয়াবোবামুনদিদিকে। বড়ো সোয়াদ বিলির মাছের—

—সে যেন তুই আমায় নতুন শেখাচ্ছিস মতি!

কালী বলে উঠলো—ওই শোনো মতির কথা ! মুচি তাআর কত বুদ্ধি হবে ?বৌদিদি যেন আর এ গাঁয়ের মানুষ?দু'দিনের জন্যে চলে গিয়েছে, তাই কি ?আবার ফিরে আসবে না বৌদি ?

—কেন আসবো না ?আমার সাধ ছিল পদ্মবিলের একেবারে ধারে একখানা ঘর বাঁধবো।

—তোমার এ ঘরও তো বিলের ধারে বৌদি। কত দূর আর ?ওই তো কাছেই।

—তা না রে, বিলের একেবারে ধারে ওই যে বাঁশঝাড়টা, ওরই পাশে ঘর বাঁধবার ইচ্ছে ছিল। বেশ ভালো হোত না ?

—এখন বাঁধো। আমি বাঁশ খড় সব জুটিয়ে দেবো বাবাকে বলে।

অনঙ্গ-বৌয়ের ঘুম এল না অনেক রাত পর্যন্ত।

সে ভাবছিল তার জীবনের গত দিনগুলির কথা।ছুতোরখালি গ্রামে তার বাপেরবাড়ি। বাবা ছিলেন সামান্যঅবস্থার গৃহস্থ, জমিজমার সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন। হরিহরপুরে কি একটা কাজে গিয়ে গঙ্গাচরণের বাবারসঙ্গে আলাপ হয়—সেই সূত্রে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেনগঙ্গাচরণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্বেই হঠাৎ তিনিমারা যান। মামাদের চেষ্টায় ও গঙ্গাচরণের বাবার দয়ায় হরিহরপুরেই বিবাহ হয়। একখানা মাত্র লালপাড় শাড়ি ও মায়ের হাতের সোনা-বাঁধানো শাখা—এর বেশি কিছু জোটেনিঅনঙ্গ-বৌয়ের ভাগ্যে বিয়ের সময়ে।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পরে গঙ্গাচরণের বাবাও মারাগেলেন। গঙ্গাচরণের জ্ঞাতিরা নানারকম শত্রুতা করতে লাগলো। হরিহরপুরে একখানা পুরোনো কোঠাবাড়ি ও একটাআমবাগান ছাড়া অন্য কিছু আয়কর সম্পত্তি ছিল না, জ্ঞাতিদেরশত্রুতায় অবস্থা শেষে এমন দাঁড়ালো যে আমবাগানেরএকটি আমও ঘরে আসে না। কোনো আয় ছিল না সংসারের, উঠোনের মানকচু তুলে কামারগাঁতির হাটে নিজের মাথায়করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে গঙ্গাচরণকে চাল কিনে আনতেহয়েছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলেছে।

একদিন খুব বর্ষার দিন। ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়েঘর ভেসে যাচ্ছে, অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে বললে—হ্যাঁগা, বাড়িঘর না সারালে এখানে তো আর থাকা যায় না !

গঙ্গাচরণ বললে—কিকরি বৌ, বসন্ত মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেসকরি নি ভাবছো ?আমি বসে নেই। দুশোটি টাকার একপয়সার কমে ও ছাদ উঠবে না।

—কোথায় পাবে দুশো টাকা ?দুটাকার সম্বল আছে তোমারা ?আমার পরামর্শ শোনো, এ দেশ ছেড়ে চলো অন্য জায়গায় যাই।

—কোথায় যাই বলো দেশ ছেড়ে, কে জায়গা দেবে ?

—সে কথা আমি জানি ?পুরুষমানুষ—সে তুমিবোঝো। আর জ্ঞাতি-শত্তুরের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে টিকেথাকতে পারবেও না তুমি।

—সেই হল ওদের দেশত্যাগের সূত্রপাত। তারপর আশ্বিন মাসে পুজোর পরই ওরা প্রথমে এল এই ভাতছালা। এখানেপ্রথম প্রথম ভালোই চলেছিল, পরে একটু অসুবিধে হয়েগেল। তার প্রধান কারণ, ভাতছালায় এরা এসেছিল স্থানীয়গোয়ালারা ধানের জমি করে দেবে আশা দিয়েছিল বলে।কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল, ধানের জমির কোনো বন্দোবস্তই আর হয়ে উঠলো না। এক বেলা খাওয়া হয় ওদের তো অন্য বেলা হয় না। সেই সময় এই কালী গোয়ালিনী যথেষ্টসাহায্য করেছিল ওদের। বিরক্ত হয়ে ওরা এখান থেকে উঠেযায় বাসুদেবপুরে। সেখানে অন্য সুবিধে মন্দ ছিল না, কিন্তু ম্যালেরিয়াতে অনঙ্গ-বৌ মরে যাওয়ার যোগাড় হল। তখননতুন গাঁয়ের কাপালীদের সঙ্গে বাসুদেবপুরের হাটেই আলাপ হয় গঙ্গাচরণের, কাপালীরা পাঠশালার মাস্টার চাইচে শুনেগঙ্গাচরণ যেতে রাজী হয়। ওরাও খুব আগ্রহ করে নিয়েযেতে চায়। সেই থেকেই নতুন গাঁয়ে বাস।

অনঙ্গ বলে—কালী ঘুমুলে নাকি ?বাবাঃ কি ঘুমতোদের !

—মতি ঘুমজড়িত স্বরে বলে—বামুন-দিদি ঘুমোওনিএখনো ?রাত যে পুইয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ো। পুবে ফর্সাহল—

—তোর মুণ্ডু হল পোড়ারমুখী—

অনঙ্গ-বৌ ভাবছিল তার জীবনে কত জায়গায় যাওয়াহল, কত কি দেখা হল। তার বয়সী কটা মেয়ে এমন নানাজায়গায় বেড়িয়েছে ?ওই তো তার সমবয়সী হৈম রয়েছে হরিহরপুরে, তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে। কোথাও যায়নি, কোনোদেশ দেখে নি।

—সে ভাবলে—ভালো কাপড় পরতে পারিনি, খেতেপাই নি তাই কি ?আমার মতো এত জায়গা বেড়িয়েছেহৈম ?কত জায়গা ! ধর হরিহরপুর, সেখান থেকে ভাতছালা, ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর—তার পর এখন নতুনগাঁ। উঃ —কথাটা কালীকে বলবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।ডাক দিলে—ও কালী, কালী, একটা কথা শোন্ না ?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বললেবামুন-দিদি, তুমি জ্বালালেদেখছি, ঘুমুতি দেবা না রাত্তিরে ?কালী ঘুমিয়ে গিয়েছেঅনেকক্ষণ, ওকে আর ডাকাডাকি কোরো না। রাত পুইয়েগেল যে।

অনঙ্গ-বৌ হেসে তার গায়ে একটা কাটি ছুঁড়ে মেরে বললে—দূর পোড়ারমুখী—

যে দু'দিন অনঙ্গ এখানে রইল, এমন নিছক আনন্দেরদুটি দিন ওর জীবনে কতকাল আসে নি। চলে আসবার দিন মতি মুচিনী কেঁদে আকুল হল। সে এ গাঁয়ে থাকতে চায়না, অনঙ্গ-বৌয়ের সঙ্গে চলে যাবে। কালী গোয়ালিনী আধসের ভালো গাওয়া ঘি ও দুটো মানকচু নিয়ে এসে দিলে।মতি খেজুরগুড়ের পাটালি নিয়ে এলো খেজুরগাছের বাকলায়বেঁধে।

গঙ্গাচরণ জিনিসপত্র দেখে বললে—বাঃ, অনেক সওদাকরে এনেছ দেখছি—

অনঙ্গ হাসি হাসি মুখে বললে—দাম দিতে হবে আমাকেকিন্তু।

—ভালো কথাই তো। কেমন দেখলে ?

—অতি চমৎকার। আমার যে কি ভালো লেগেছে ! মতিএল, কালী এল, গাঁয়ের কত ঝি-বৌ দেখতে এল—

—ওরা এখনো ভোলে নি আমাদের ?

—ভুলে যাবে ?সবাই বলে এখানে এসে আবার বাসকরুন বামুন-দিদি। হ্যাঁগা, পদ্মবিলের ধারে একখানা ঘর বাঁধো না কেন ?আমার বড্ড সাধ কিন্তু।

—আবার ভাতছালা ফিরে যাবে ?সে হয় না। পাঠশালাজমে উঠেছে। এখন কি নড়া যায়। গেলেই লোকসান।

—তুমি যা ভালো বোঝো। আমার কিন্তু বাপু ওখানেএকখানা ঘর বাঁধবার বড্ড ইচ্ছে।

গঙ্গাচরণ সেদিন পাঠশালা জমিয়ে বসেছে, সামনের পথ দিয়ে একজন পথচলতি লোক যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাঠশালার মধ্যে ঢুকে বললে—এটা পাঠশালা ?

—হ্যাঁ।

—মশাই দেখচি ব্রাহ্মণ, একটু তামাক খাওয়াতে পারেন ?আমিও ব্রাহ্মণ। নমস্কার।

—বসুন, বসুন, নমস্কার—ওরে—

গঙ্গাচরণের ইঙ্গিতে একজন ছাত্র তামাক সাজতে ছুটলো।

আগন্তুক লোকটির পায়ে পুরোনো ও তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে মলিন পিরান, হাতে একগাছি তৈলপক্ক সরু বাঁশের ছড়ি। পায়ে জুতো থাকা সত্ত্বেও সাদা ধুলো হাঁটুপর্যন্ত উঠেছে। লোকটি একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরক্লান্তভাবে বসে পড়লো।

গঙ্গাচরণ বললে—মশায়ের নাম ?

—আজ্ঞে দুর্গা বাঁড়ুয্যে। নিবাস, কুমুরে নাগরখালি, আড়ংঘাটার সন্নিকট। আমিও আপনার মতো ইস্কুল মাস্টার।অম্বিকপুর চেনেন ?এখান থেকে পাঁচ কোশ পথ। অম্বিকপুরেলোয়ার প্রাইমারি ইস্কুলে সেকেন পণ্ডিত।

—বেশ, বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন—

—আগে আমায় একটু জল খাওয়াতে পারেন ?

—ডাব খাবেন ?ওরে পাঁচু, যাও বাবা, হরি কাপালীর চারাগাছ থেকে আমার নাম করে দুটো ডাব চট্ করে পেড়েনিয়ে এসো তো ?

আগন্তুক লোকটি প্রশংসমান দৃষ্টিতে গঙ্গাচরণের দিকেচেয়ে বললেবাঃ, আপনার দেখচি এখানে বেশ পসার !

গঙ্গাচরণ মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিনিজের পসার-প্রতিপত্তির কথা নিজের মুখে বলে না।

ইতিমধ্যে ডাব এসে পড়লো। ডাবের জল খেয়ে দুর্গাপদবাঁড়ুয্যে আরামের নিশ্বাস ফেলে হুঁকো হাতে নিয়ে সজোরেধূমপান করতে লাগলো। আপন মনেই বললে—বেশ আছেনআপনি—বেশ আছেন—

গঙ্গাচরণ বিনীতভাবে বললে—আপনাদের বাপ-মায়েরআশীর্বাদে এক রকম চলে যাচ্চে—

—না, না, বেশ আছেন। দেখে আনন্দ হয়, আমার মতোইইস্কুল মাস্টার একজন, ভালো ভাবে থাকতে দেখলেই আনন্দহয়।।

—আপনি ওখানে কি রকম পান ?

—মাইনে পাই তিন টাকা ইস্কুল থেকে। গভর্নমেন্টেরএড্ পাই দেড় টাকা। ইউনিয়ন বোর্ডের এড্ পাই ন'-সিকেমাসে। এই ধরুন সর্বসাকুল্যে পৌনে সাত টাকা। তা একরকম চলে যায়—

গঙ্গাচরণ বললে—মাসে মাসে পান তো ?

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে গর্বের সুরে বললে—নিশ্চয়ই, এ হল গভর্নমেন্টের কারবার। এতে কোনো গোলমাল হবার জোটি নেই। তবে মোটে সাত টাকায় সংসার ভালো চলে না।

—মশায়ের ছেলেপিলে কি ?

—একটি মাত্র মেয়ে, আর আমার পরিবার। তবে আমারবিধবা ভগ্নী আমার সংসারেই থাকে। সাত টাকায় এতগুলি লোকের—

—আর কিছু আয় নেই ?

—আজ্ঞে না। আমি বিদেশী লোক, ওখানে আর কিআয় থাকবে ?

—ও গ্রামে কি ব্রাহ্মণের বাস বেশি ?নাকি অন্য অন্যজাতও আছে ?আপনি সঙ্গে সঙ্গে দশকর্ম ধরুন না কেন! এইধরুন লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজো ষষ্ঠীপুজোটুজো—

—ও-সব চলবে না। সেখানে পুরুত আছে গ্রামে।ব্রাহ্মণের গ্রাম—

—ওখানেই আপনি ভুল করেছেন—এই! গোলমাল করবি তো একেবারে পিঠের ছাল তুলবো সব। ব্রাহ্মণেরগ্রামে বসতে নেই কক্ষনো। ওতে পসার হয় না মশাই—

—কথাটা ঠিকই বলেছেন। আপনি বেশ আছেন, ডাবআনতে বললেন অমনি ডাব এসে হাজির। অমন না হলেবাসের সুখ ! আমার আর কোনো আয় নেই ওই পৌনে সাতটাকা ছাড়া। তবে ধরুন কলাটা, বেগুনটা মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরাআনে।

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে কতাবার্তার ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে কিভাবতে লাগলো। পুনরায় তামাক সেজে যখন হুঁকো তার হাতেদেওয়া হল, তখন বললে—একটা কথা ভাবচি—

—কি বলুন ?

—দু'জনে মিলে আপার প্রাইমারি ইস্কুল গড়ে তুলি নাকেন ?আপনি কি গুরুট্রেনিং পাস ?

—না।

দুর্গাপদ চিন্তাকুলভাবে বললে—তাই তো ! গুরুট্রেনিংপাস না থাকলে হেড মাস্টার হতে পারবেন না যে ! বাইরেথেকে আবার কাউকে আনলে তাকে ভাগ দিতে হবে কিনা ?সে নিজের কোলে সব ঝোল টেনে নেবে। তাতে সুবিধে হবে না—আমার ওখানে আর ভালো লাগছে না। সঙ্গী নেই, দুটোকথা কইবার মানুষ নেই—ব্রাহ্মণ যা আছে, সব অশিক্ষিত, চাষবাসই নিয়ে আছে। সংসার অনিত্য, আমি মশাই আবার একটু ধম্মকথা, একটু সৎ আলোচনা বড্ড পছন্দ করি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—এই রে, খেয়েছে ! মুখেবললে—সে তো খুব ভালো কথা।

—আপনি আর আমি সমব্যবসায়ী। তাই আপনার কাছেএত কথা খুলে বললাম। কিছু মনে করবেন না যেন। আচ্ছাআজ উঠি। অনেকদূর যেতে হবে।

—আবার যখন এদিকে আসবেন, দেখা দেবেন দয়াকরে।

—সে আর বলতে মশাই ?একদিন আমার পরিবারকেনিয়ে এসে আপনাদের বাড়িতে আলাপ করিয়ে দেবো। আচ্ছাআসি, নমস্কার—

গ্রামের বিশ্বাস মশায়ের নাতিটি কাকতলীয়ভাবে সুস্থ হয়েউঠলো গঙ্গাচরণের শান্তিস্বস্ত্যয়নের পরে। এতে গঙ্গাচরণেরপসার আরো বেড়ে গেল গ্রামের লোকদের কাছে। একদিন একজন লোক এসে গঙ্গাচরণকে বললে—আমাদের গাঁয়েএকবার যেতে হচ্ছে পণ্ডিত মশায়—

—এসো, বসো। কোথায় বাড়ি ?

—কামদেবপুর, এখান থেকে তিন ক্রোশ। আপনারনাম শুনে আসছি। সবাই বললে, পণ্ডিত মশায় গুণী লোক।আমাদের আশেপাশে বড় ওলাউঠোর ব্যায়রাম চলছে। আপনাকে যেয়ে আমাদের গাঁ বন্ধ করতে হবে।

গঙ্গাচরণ 'গাঁ বন্ধ করা' কথাটা প্রথম শুনলো। তবুও আন্দাজ করে নিল লোকটা কি চাইছে। তাদের গ্রামে যাতে ওলাউঠার অসুখ না ঢোকে, এজন্যে মন্ত্র পড়ে গ্রামেরচারিদিকে গণ্ডি টেনে দিয়ে মহামারীর আগমন বন্ধ করতেহবে, এই ব্যাপার।

কাঁচা লোকের মতো গঙ্গাচরণ তখনই বলে উঠলো না, 'হ্যাঁ, এখুনি করে দেবো, তাতে আর কি ?ইত্যাদি। সেগম্ভীরভাবে তামাক টেনে যেতে লাগলো, উত্তরে 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না।

লোকটি উদ্বিগ্নসুরে বললে—ঠাকুর মশায়, হবে তোআমাদের ওপর দয়া ?

গঙ্গাচরণ স্থিরভাবে বললে—তাই ভাবছি।

—কেন পণ্ডিত মশায়?এ আপনাকে হাতে নিতেইহবে—

—বড্ড শক্ত-কাজ। বড্ড শক্ত—

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। পরে লোকটা পুনরায় আকুলভাবেবললে—তবে কি হবে না ?

গঙ্গাচরণ নীরব ?দু'মিনিট।

—পণ্ডিত মশায়?

—বাপু হে, অমন বকবক কোরো না। মাথা ধরিয়ে দিলেযে বকে ! দাঁড়াও, ভাবতে দাও—

লোকটা ধমক খেয়ে চুপ করে রইল, যদিও সে বুঝতেপারল না এতক্ষণ সে এমন কি বকছিল, যাতে পণ্ডিত মশায়েরমাথা ধরতে পারে। নিজে থেকে সে কোনো কথা বলতেআর সাহস করলে না। গঙ্গাচরণ নিজেই খানিকটা চিন্তার পরবললে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা।পয়সা খরচ করতে হবে, পারবে ?

লোকটা এবার উৎসাহ পেয়ে বললে, আপনি যা বলেন পণ্ডিতমশাই। আমাদের গাঁয়ে আমরা ষাট-সত্তর ঘর বাস করি। হিঁদু-মোছলমানে মিলে চাঁদা তুলে খরচ যোগাবো। প্রাণ নিয়েকথা, আশপাশের গাঁ মরে উজোড় হয়ে যাচ্ছে, যদি পয়সাখরচ কল্লি আমাদের প্রাণগুলো বাঁচে—

—নদীর জল খাও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের নিচেই বাঁওড়—বাঁওড়েরজল খাই।

—গাঁ বন্ধ করলে বাঁওড়ের জল আর খেতে পাবে নাকেউ। পাতকুয়োর জল খেতে হবে।

—সে আপনি যেমন আজ্ঞে করবেন—কত খরচ হবেবলুন ?

গঙ্গাচরণ মনে মনে হিসেব করবার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ পরে বললে—সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ হবে—ফর্দকরে দিচ্চি নিয়ে যাও।

লোকটা যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এত গম্ভীর ভূমিকারপর মাত্র ত্রিশটি টাকা খরচের প্রস্তাব সে আশা করে নি। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশার সীমা পৌঁছে গিয়েছে, ভাতছালাতেও যাকে স্ত্রীপুত্রসহ অনেক সময় দিনেরাতে একবার মাত্র অন্নাহারকরে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, সে এর বেশি চাইতে পারে কিকরে ?

—গঙ্গাচরণ বাড়ির মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে।সংসারের কি কি দরকার ?অনঙ্গ-বৌ বেশি আদায় করতে জানে না। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে একটা ফর্দ খাড়া করলে, তেমন ব্যয়সাধ্য ফর্দ নয়।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুমি গাঁ বন্ধ করতে পারবে তো ?এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—

গঙ্গাচরণ হেসে বলল—আমি পাঠশালায় ছেলেদের ‘স্বাস্থ্য প্রবেশিকা’ বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিত অনুচিত। আসলে তাতেই গাঁ বন্ধহবে। মন্ত্র পড়ে গাঁ বন্ধ করতে হবে না।

বাইরে এসে বললে—ফর্দ লিখে নাও—আলোচাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশআড়াই সের—কাপড় চাই তিনখানা শাড়ি, কস্তাপেড়ে, তিন ভৈরবীর, আর প্রমাণ ধুতিচাদর ভৈরবের—আরো ধরো—হোমের তাম্রকুণ্ড।

লোকটা ফর্দ নিয়ে চলে গেল।

কামদেবপুর গ্রামে যেদিন গঙ্গাচরণ যায়, সেদিন সেখানে একজন বললে—পণ্ডিত মশাই, চাল বড্ড আক্রা হবে, কিছুচাল এ সময়ে কিনে রাখলে ভালো হয়।

—কত আক্রা হবে ?

—তা ধরুন মণে দু টাকা চড়া আশ্চয্যি নয়।।

কথাটা উপস্থিত কেউই বিশ্বাস করলে না। শান্তিস্বস্ত্যয়নএবং গাঁ বন্ধ করার প্রক্রিয়া দেখবার জন্য আশপাশ থেকে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। গ্রামের চাষিরা বললে—মণেদুটাকা ! তাহলি আর ভাবনা ছেল না। কে বলেছে এ সব কথা ?

আগেকার বক্তা নিতান্ত বাজে লোক নয়—ধান চালেরচালানি কাজ করেছে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে বলে মনেহয়। সে জোর গলায় বললে—তোমরা কিছু বোঝে নাহে—আমার মনে হচ্চে গতিক দেখে, চালের দর ঠিক বাড়বে।আমি এ কারবার অনেকদিন ধরে করে আসছি, আমি বুঝতেপারি।

কথাটা কেউ গায়ে মাখলে না। তখন গাঁ বন্ধ করার ব্যাপার নিয়ে সকলে গঙ্গাচরণকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। হোম শেষ করে পুজো আরম্ভ করতে গঙ্গাচরণ পুরো তিনটি ঘণ্টাকাটিয়ে দিলে। এসব অজ পাড়াগাঁ, এখানকার হাল-চাল ভালোই জানা আছে তার। পয়সা কি অমনি অমনি রোজগারহয় ?তিনটি মাটির কলসি সিঁদুর দিয়ে চিত্রিত করতে হয়েছে, তালপাতার তীর বানিয়ে চারকোণে পুঁতে পৈতের সুতো দিয়েসেগুলো পরস্পর বাঁধতে হয়েছে, গাবকাঠের পুতুল তৈরিকরতে হয়েছে গ্রাম্য ছুতোর দিয়ে, তেল সিঁদুর লেপে সেটাকেতেমাথা রাস্তায় পুঁততে হয়েচে-হাঙ্গামা কি কম ?সে যতবিদঘুটে ফরমাশ করে, গ্রামের লোকের তত শ্রদ্ধা বেড়ে যায়তার ওপরে।

ওর কানে গেল লোকে বলাবলি করচে—বলি, এ কিতুই যা তা পেলি রে ?ওঁর পেটে এলেম কত?যাকে বলেপণ্ডিত। এ কি তুই বাগান-গাঁর দীনু ভট্চার্য পেয়েছিস?

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—নিষ্কালি সরা দু'খানা আর শ্বেতআকন্দের ডাল দুটো—

ঠিক দুপুরবেলা, এখন এ সব জিনিস কোথা থেকেযোগাড় হয়, আর কেই বা আনে ! সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়িকরতে লাগলো।

একজন বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে, এ গাঁয়ে তো কুমোর নেই, নিষ্কালি সরা এখন কোথায় পাই ?

গঙ্গাচরণ রাগের সুরে বললে—তবে থাকলো পড়ে, ফাঁকি-জুকির কাজ আমায় দিয়ে হবে না। গাঁ বন্ধ করতে নিষ্কালি সরা লাগে একথা কে না জানে ?আগে থেকে যোগাড়করে রেখে দিতে পারো নি ?

গ্রামের লোকে নিজেদের অজ্ঞতায় নিজেরাই লজ্জিতহয়ে উঠলো। বলাবলি করলে—এ খাঁটি লোক বাবা। এরকাছে কোনো কাজের ফাঁকি নেই। যেভাবে হোক সরা এনেদিতেই হবে।

নানা অপরিচিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বেলা দুটোরসময়ে প্রক্রিয়া শেষ হল।

গঙ্গাচরণ বললে—সবাই এসে শান্তিজল নিয়ে যাও—

খুব ঘটা করে শান্তিজল ছিটিয়ে দিয়ে গঙ্গাচরণ গম্ভীর মুখে বললে—এবার আসল কাজটি বাকি—

উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে চায়। সকাল থেকেফাইফরমাশের চোটে প্রত্যেকে হিমসিম খেয়ে গিয়েছে, শান্তিজল ছিটানো হয়ে গেল, তবুও এখনো আসল কাজটিহল না ! বেলা তিনটা বাজে এদিকে।

গ্রামের মাতব্বর লোক এক-আধজন এগিয়ে বললে— আজ্ঞে, কি কাজের কথা বলছেন পণ্ডিত মশাই ?

—ঈশান কোণে নিমগাছ আছে এ গাঁয়ে ?

—আজ্ঞে কোথায় বললেন ?

—ঈশান কোণে।

তারা মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে—সে কোথায় ?

ঈশান কোণ জানো না ?উত্তর-পশ্চিম কোণ—এই দিক—

আঙুল দিয়ে গঙ্গাচরণ ঈশান কোণ দেখিয়ে দেয়। গ্রামেঢুকবার পথই সেদিক দিয়ে, আসবার সময় সেদিকে একটা বড় নিমগাছ সে লক্ষ্য করে এসেচে আজই সকালবেলা।

একজন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বটে একটা।

—আছে ?থাকতেই হবে। ঈশানে যোগিনী যে—

—আজ্ঞে, কি করতে হবে ?

—ওখানে ধ্বজা বাঁধতে হবে। চলো আমার সঙ্গে—

দুজন জোয়ান ছোকরা গঙ্গাচরণের আদেশে নিমগাছের মগডালে ধ্বজা বাঁধতে উঠলো। বেলা চারটে বাজে।

গঙ্গাচরণ হাঁপ ফেলে নিশ্চিন্ত হবার ভঙ্গিতে বললে— যাক, এবার ব্যাপারটা মিটে গেল। বাবাঃ, পয়সা খরচ করে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করলে তোমরা, এর মধ্যে খুঁত থাকতেদেবো কেন ?এবার তোমরাও নিশ্চিন্দি, আমিও নিশ্চিন্দি। গাঁ বন্ধ বললেই গাঁবন্ধ হয় ! খাটুনি আছে।

সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলো। এমনহলে পণ্ডিত ?

গ্রামের সবাই মিলে অনুরোধ করে এক গোয়ালাবাড়িতেনিয়ে গিয়ে গঙ্গাচরণের জলযোগের ব্যবস্থা করলে। গঙ্গাচরণবললে—ডাবের জল ছাড়া আমি অন্য জল খাবো না।তোমরাও নদীর জল ব্যবহার করা বন্ধ কর একেবারে। একমাসকাল নদীর জল কেউ খেতে পাবে না। বাসি বা পচাজিনিস খাবে না। মাছি বসলে সে খাবার তখুনি ফেলে দেবে।মনে থাকবে ?সবাইকে বলে দাও—

মাতব্বর লোকেরা সকলকে কথাটা বুঝিয়ে দিলে।

সন্ধ্যার আগে গরুরগাড়ি করে ফিরচে, পথে গ্রাম্য পুরোহিত দীনু ভট্চার্য এসে বললে-নমস্কার, চললেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার একটা কথা আছে, গাড়ি থেকে নেমে একটুশুনুন—

গঙ্গাচরণ গাড়ি থেকে নেমে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েদীনু ভট্চাযের সঙ্গে কথা বললে। দীনু ওর হাত ধরেবললে—আমার একটা অনুরোধ—

—হ্যাঁহ্যাঁ—বলুন—

—আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন—

—কেন ?

—আমি না খেয়ে মরচি। ঘরে এক দানা চাল নেই।হু হু করে বাড়চে। ছিল সাড়ে চার, হল ছ'টাকা।পাঁচ-ছটি পুষ্যি নিয়ে এখন চালাই কি করে বলুন ?আমি নিজেএই বুড়ো বয়সে রোজগার না করলে সংসার চলে না। অথচবুড়ো হয়ে পড়েচি বলে এখন আর কেউ ডাকেও না, চোকিআর তেমনভালোদেখি নে।

গঙ্গাচরণ চুপ করে থেকে বললে—তাই তো বড় মুশকিল দেখ্‌চি—আপনার বয়স কত ?

—ঊনসত্তর যাচ্চে। মেয়েরা বড়, ছেলে বড় হলে ভালো ছিল। এ বুড়ো বয়সে রোজগার করার কেউ নেই আমি ছাড়া।

—চালের দাম কত চড়েচে ?

—আরো নাকি চড়বে শুনচি। এখনই খেতে পাচ্চি নে—আরো বাড়লে কি কিনে খেতে পারবো ! এই যুদ্ধুর দরুননাকি অমনটা হচ্চে—

গঙ্গাচরণ মাঝে-মিশালে শোনে বটে যুদ্ধের কথা ! মাঝেমাঝে দু-একখানা এরোপ্লেন মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াতকরতে দেখেছে। তবে এ অজ চাষাগাঁয়ে কেউ খবরের কাগজনেয় না, শহরও সাত-আট মাইল দূরে। গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে। ওসব চর্চা করবার সময়ও তার নেই। তবুও কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললে। সে বুড়ো ভট্চাযকে বললে—যা চাল পেয়েছি, তা থেকে কিছু আপনি নিয়েযান—আর কিছু ডাল আর গাওয়া ঘি—

দীনু ভট্চায বললে—না, গাওয়া ঘি আমার দরকার নেই।বলে ভাত জোটে না, গাওয়া ঘি ! আচ্ছা, আমি এই কাপড়ের মুড়োতেই চাল ডাল বেঁধে নিই। আপনি আমায় বাঁচালেন। ভগবানআপনার ভালো করুন।

কথাটা ভাবতে ভাবতে গঙ্গাচরণ বাড়ি এসে পৌঁছুল।অনঙ্গ-বৌ জিনিসপত্র দেখে খুব খুশি। বললে—চাল এত কমকেন ?

—এক বুড়ো বামুন ভট্চায্যিকে কিছু দিয়ে এসেছি পথে।

—যাক গে, ভালোই করেচ। দিলে তাতে কমে না, বরংবেড়ে যায়।

—শুনচি নাকি চালের দাম বাড়বে, সবাই বলছে।

—ছ’টাকা থেকে আরো বাড়বে ?বল কি গো ?

—সবাই তো বলচে। যুদ্ধুর দরুন নাকি এমন হচ্ছে—

—কার সঙ্গে যুদ্ধু বেধেছে গো ?

—সে সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমাদের রাজার সঙ্গেজার্মানি আর জাপানের—সব জিনিস নাকি আক্রা হয়ে উঠবে।

—হোক গে, আমাদের তো অর্ধেক জিনিস কিনে খেতেহয় না। তবে চালটা যদি বেড়ে যায়—

—সেই কথাই তো ভাবচি—

সেদিন বিকেলে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ি বসে এই সবকথার আলোচনা হচ্ছিল। বিশ্বাস মশায় বললেন—আমাদেরভাবনা কি ?ঘরে আমার দু'গোলা ধান বোঝাই। দেখা যাবেএর পরে।

বৃদ্ধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—এ সব হ্যাঁঙ্গামা কতদিনেমিটবে ঠাকুর মশাই ?শুনচি নাকি কি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েছে ?

বিশ্বাস মশায় বললে—সিঙ্গাপুর—

নবদ্বীপ বললে—সে কোন্ জেলা ?আমাদের এই যশোর, না খুলনে ?মামুদপুরের কাছে ?

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন—যশোরও না, খুলনেও না।সে হল সমুদুরের ধারে। বোধ হয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুরজেলা। তাই না পণ্ডিত মশাই ?

গঙ্গাচরণ ভালো জানে না, কিন্তু এদের সামনে অজ্ঞতাটাদেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং সে বললে—হ্যাঁ একটুদূরে—পশ্চিম দিকে। ঠিক কাছে নয়।

নবদ্বীপ বললে—পুরীর কাছে ?আমার মা একবারপুরী গিয়েছিলেন। পুরী, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর। সে বুঝিমেদিনীপুর জেলা ?

বিশ্বাস মশায় বললেন—হ্যাঁ।

ভৌগোলিক আলোচনা শেষ হলে যে যার বাড়ির দিকেচলে গেল।

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বসে পরদিন ছেলেদের জিজ্ঞেস করলে—এই সিঙ্গাপুর কোথায় জানিস ?

কেউ বলতে পারলে না, কেউ নামই শোনে নি।

গঙ্গাচরণ নিজের ছেলের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললে—হাবু, সিঙ্গাপুর কোথায় ?হাবু দাঁড়িয়ে উঠে সগর্বে বললে—পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলায়।

পাঠশালর অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতেহাবুর দিকে চেয়ে রইল।

বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে কতকগুলি আশ্চর্য পরিবর্তনলক্ষ্য করলে গঙ্গাচরণ বাজারের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে। প্রত্যেক জিনিসের দাম ক্রমশ চড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা যাক গে, সেদিন হাটে একটা ঘটনা দেখে শুধু গঙ্গাচরণ নয়, হাটেরসব লোকই অবাক হয়ে গেল।

ঘটনাটা অতি সামান্য। ইয়াসিন বিশ্বাসের বড় গোলদারিদোকান। তাতে কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে অনেকে শুধু হাতে ফিরে গেল। তেল নাকি নেই !

গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হল না কথাটা। সে নিজেও তেল নেবে। তেলের বোতল হাতে দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়াসিনের দাদা ইয়াকুব বললে—তেল নেই পণ্ডিত মশাই—

—নেই ?

—আজ্ঞে না।

—তেল আনো নি ?

—আজ্ঞে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি কথা ?ক্রাসিন পাওয়া যাচ্ছে না ?

—আমাদের চালান আসে নি এবার একদম। শুনলাম নাকি মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতে হবে চালান পাঠাবার আগে।

—কবে আসতে পারে ?

—আজ্ঞে কিছু ঠিক নেই—

—গঙ্গাচরণ বোতল হাতে বেরিয়ে আসছে, ইয়াকুব সুর নিচু করে বললে-বাবু, এই বেলা কিছু নুন আর কিছু চালকিনে রাখুন—ও দুটো জিনিস যদি ঘরে থাকে, তা হলে কষ্টশ্রেষ্টকরে আধপেটা খেয়েও চলবে।

—কেন, ও দুটো জিনিসও কি পাওয়া যাবে না নাকি?

—পণ্ডিতমশাই, সাবধানের মার নেই, আমরা হলাম ব্যবসাদার মানুষ, সব দিকে নজর রেখে চলতি হয় কিনা?কে জানে কি হয় মশাই !

গঙ্গাচরণ ভাবতে ভাবতে বাড়ি চলে এসে স্ত্রীকেবললে—আজ একটি আশ্চর্য কাণ্ড দেখলাম—

—কি গা ?

—পয়সা হলেও জিনিস মেলে না এই প্রথম দেখলাম।কোনো দোকানেই কেরাসিন তেল নেই—আরো একটি কথা বললে দোকানদার, চালও কিনে রাখতে হবে নাকি!

অনঙ্গ-বৌ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—দূর ! রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুরি কথা। চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়াযাবে না, তবে দুনিয়া পৃথিমে তোক বাঁচতে পারে ক্খনো ?কি খাবে এখন ?

—যা দেবে !

—অনঙ্গ টাটকা-ভাজা মুড়ি গাওয়া ঘিতে মেখে নিয়েএসে দিলে—তার সঙ্গে শসা কুচোনো। বললে—একটু চিনিদেবো, ওর সঙ্গে মেখে খাবে ?

—না, চিনি আমার ভালো লাগে না। হাবু কোথায় ?

—বাড়ি নেই। বিশ্বেস মশায়ের নাতির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে কিনা। ডেকে নিয়ে গেল এসে। বড় মানুষের নাতির সঙ্গে ভাব থাকা ভালো। সময়ে অসময়ে দুটো জিনিস চাইলেও পাওয়া যাবে। সেজন্যে আমিও যেতে বারণ করি নি।

—এসো দুটো মুড়ি খাও আমার সঙ্গে।

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হেসে বললে—আহা, রস যে উথলেউঠছে। আজ বাদে কাল যে ছেলের বৌ ঘরে আনতে হবে, খেয়াল আছে ?

বলেই এসে স্বামীর পাশে বসে বাটি থেকে একমুঠোঘি-মাখা মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিল। স্বামীর দিকেবিলোল কটাক্ষে চেয়ে বললে—মনে পড়ে, সেই ভাতছালায় বিলের ধারে একদিন তুমি আর আমি এক বাটি থেকে চিঁড়েরফলার খেয়েছিলাম ?হাবু তখন ছোট।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি ও চোখের বিলোল দৃষ্টি প্রমাণকরিয়ে দিলে সে বিগত-যৌবনা নয়, পুরুষের মন এখনো হরণ করার শক্তি সে হারায় নি।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

ফাল্গুন মাসের শেষে গঙ্গাচরণ একদিন পাঠশালায় ছুটি দিয়ে চলে আসছে, কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত পথে ওকে ধরে বললে—ভালো আছেন? সেদিন গিয়েছিলেন কামদেবপুর, আমি ছিলাম না, নমস্কার।

—নমস্কার। ভালো আছেন ?

—একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গেই দেখা করতেআসা।

—কেন বলুন ?

—আমার তো আর ওখানে চলে না। পৌনে সাত টাকামাইনেতে একবারে অচল হল। চালের মণ হয়েছে দশ টাকা।

গঙ্গাচরণের বুকটার মধ্যে ধ করে উঠলো। অবিশ্বাসেরদৃষ্টিতে দুর্গা পণ্ডিতের দিকে চেয়ে সে বললে—কোথায়শুনলেন ?

—আপনি জেনে আসুন রাধিকাপুরের বাজারে।

—সেদিন ছিল চার টাকা, হল ছ'টাকা, এখন অমনি দশটাকা !

—মিথ্যে কথা বলি নি, খোঁজ নিয়ে দেখুন।

—মণে চার টাকা চড়ে গেল ! বলেন কি ?

—তার চেয়েও একটি কথা শোনলাম, তা আরোভয়ানক। চাল নাকি এবার না কিনলে এরপরে বাজারে আরমিলবে না। শুনে তো পেটের মধ্যে হাত পা ঢুকে গেল মশাই।

গঙ্গাচরণের সঙ্গে দুর্গা পণ্ডিত ওর বাড়ি পর্যন্ত এল।গঙ্গাচরণের বাইরের ঘর নেই, উঠোনের ঘাসের ওপরে মাদুরপেতে দুর্গা পণ্ডিতের বসবার জায়গা করে দিলে। তামাকসেজে হাতে দিলে। বললে—ডাব কেটে দেবো ?খাবেন ?

—হ্যাঁ, সে তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। বেশআছেন !

—আর কিছু খাবেন ?

—না, না, থাক। বসুন আপনি।

একথা ওকথা হয়, দুর্গা পণ্ডিত কিন্তু ওঠবার নাম করে না।

গঙ্গাচরণ ভাবলে, কামদেবপুর এতটা পথ—যাবে কিকরে ?সন্দে তো হয়ে গেল।

আরো বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। গঙ্গাচরণ কিছু বুঝতেপারছে না।

এখনো যায় না কেন ?শীতের বেলা, কোন্ কালেসূর্য অস্তে গিয়েছে।

হঠাৎ দুর্গা পণ্ডিত বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা—এবেলাআমি দুটো খাবো কিন্তু এখানে।

—খাবেন ?তাহলে বাড়ির মধ্যে বলে আসি।

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে চাল ভাজছিল, স্বামীকে দেখে বললে—ওগো, তোমার সেই পণ্ডিত মশায়ের জন্যে দুটোচাল ভাজছি যে। তেল নুন মেখে তোমরা দুজনেই খাওগে—

—শোনো, পণ্ডিত মশাই রাত্তিরে এখানে খাবেন।

—তুমি বললে বুঝি ?

—না, উনিই বললেন, আমি কিছু বলি নি।

—অন্য কিছু নয়, কি দিয়ে ভাত দিই পাতে ?একটু দুধযা ছিল ওবেলা তুমি আর হাবু খেয়েছে।

দুর্গা পণ্ডিতের কথাবার্তা শুনে গঙ্গাচরণের মনে হল সে খুব ভয় পেয়েছে। এমন একটা অবস্থা আসবে সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না।ওর ভয়ের ছোঁয়াচ এসে গঙ্গাচরণেরমনেও পৌঁছায়। বাইরে ঘোড়ানিম গাছটার তলায় অন্ধকার রাত্রে বসবার জন্যে হাবু একটা বাঁশের মাচা করেছিল। দুইপণ্ডিতে সেই মাচার ওপর একটি মাদুর বিছিয়ে দিব্যি ফুরফুরেফাল্গুনে হাওয়ায় বসে তামাক ধরিয়ে কথাবার্তা বলছিল।হাবু এসে বললে—বাবা, নিয়ে এসো ওঁকে, খাওয়ার জায়গাহয়েছে—

মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা ও বড়াভাজা।অনঙ্গ-বৌ রাঁধতে পারে খুব ভালো। দুর্গা পণ্ডিতের মনে হলএমন সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন অনেক দিন খায় নি। হাবু বললে—মাজিজ্ঞেস করছে আপনাকে কি আর দুখানা বড়াভাজা দেবে ?

গঙ্গাচরণও ওই সঙ্গে খেতে বসেচে। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে আয় না। জিজ্ঞেস করাকরি কি ?

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে থেকে হাবুর হাতে পাঠিয়ে দিলেএকটা রেকাবিতে কিছু পেঁপের ডালনা, ক'খানা বড়াভাজা।

গঙ্গাচরণ বললে—ওগো, তুমি ওঁর সামনে বেরোও, উনিতোমার ধনপতি কাকার বয়েসী। আপনার বয়েস আমার চেয়ে বেশি হবে, কি বলেন ?

দুর্গা পণ্ডিত বললেন—অনেক বেশি। বৌমাকে আসতেবলুন না ?একটা কাঁচা ঝালনিয়ে আসুন।

একটু পরে অনঙ্গ-বৌ লজ্জা-কুণ্ঠা-জড়িত সুঠাম সুগৌর কাচের চুড়ি-পরা হাতে গোটা-দুই কাঁচালঙ্কা এনে দুর্গা পণ্ডিতের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পণ্ডিত ওর দিকে মুখতুলে চেয়ে বললে--মা যে আমার লক্ষ্মী পিরতিমে। আমারএক ভাইঝির বয়িসী বটে। কোনো লজ্জা নেই আমার সামনে বৌমা—একটু সরষের তেল আছে ?দাও তো মা—

হাবু বললে মা বলচে, দুধ নেই। একটু তেঁতুল গুড় মেখে ভাত ক'টা খাবেন ?

—হাঁ হাঁ, খুব। দুধ কোথায় পাবো ?বাড়িতেই কি রোজ দুধ খাই নাকি ?

দুর্গা পণ্ডিত এই বয়সেও কিন্তু বেশ খেতে পারে। মোটাআউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত শুধু তেঁতুল গুড় মেখেই যাখেলে, গঙ্গাচরণের তা দু'বেলার আহার। অনঙ্গ-বৌ কিন্তুখুব খুশি হল দুর্গা পণ্ডিতের খাওয়া দেখে। যে মানুষ খেতেপারে, তাকে নাকি খাইয়ে সুখ। নিজের জন্যে বড়াভাজাগুলো সে সব দিয়ে দিলে অতিথির পাতে।

গঙ্গাচরণ মনে মনে ভাবলে পৌনে সাত টাকায় বেচারিনিশ্চয়ই আধ পেটা খেয়ে থাকে—

রাত দশটার বেশি নয়। একটু ঠাণ্ডা রাতটা। আবার এসেদুজনে বসলো নিমগাছের তলায় বাঁশের মাচায়। হাবু তামাক সেজে এনে দিলে।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—এখন কি করি আমায় একটাপরামর্শ দাও তো ভায়া। যে রকম শুনছি—

গঙ্গাচরণ চিন্তিত সুরে বললে—তাই তো ! আমারও তোকেমন কেমন মনে হচ্ছে। কেরোসিন তেল বাজারে আরপাওয়া যাচ্ছে না, আবার কাল থেকে শুনছি দেশলাইও নাকিনেই।

—সে মরুক গে, যাক কেরোসিন তেল। অন্ধকারেথাকবো। কিন্তু খাবো কি ?চাল নাকি মোটেই মিলবে না!দামও চড়বে !

—দাম আরো চড়বে ?দশ টাকা হয়েছে, আরো ?

—একজন ভালো লোক বলছিল সেদিন। এই বেলাকিছু কিনে রাখতি পারলে ভালো হোত, কিন্তু পৌনে সাত টাকা মাইনেতে রোজকার চাল কেনাই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি হল ও গাঁয়ের রতিকান্ত ঘোষ। গোলাপালা আছে বাড়িতে। ধানচাল মজুদ আছে। সেদিন বললাম আমায় একমণ চাল দিন, মাইনে থেকে কেটে নেবেন। তা আধমণ দিতে রাজী হয়েছে।

—আপনার কত চাল লাগে রোজ ?

—তা সকালবেলা উঠলি একপালি করে চালির খরচ। খেতে দুবেলায় আট-ন'টি প্রাণী। কি করে চালাই বলো তো ভায়া ?ও আধমণ চালে আমার ক'দিন ?

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—তার ওপর খাওয়ার যাবহর ! অমনি যদি সকলের হয় বাড়িতে, তবে রতিকান্ত ঘোষেরবাবাও চাল যুগিয়ে পারবে না—

দুর্গা পণ্ডিত কিছুতেই ঘুমুতে যায় না। মাঝে পড়েগঙ্গাচরণেরও ঘুম হয় না। অতিথিকে ফেলে রেখে সে একাশুতে যায় কি করে ?তার নিজের যে ভয় একেবারে না হয়েছে তা নয়।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—একটা বিহিত পরামর্শ দাও তো ভায়া। ওখানে একা একা থাকি, যত সব অজ মুখ্যুদেরমধ্যিখানে। আমরা কি পারি ?আমার চাই একটু সৎসঙ্গ, বিদ্যে পেটে আছে এমন লোকের সঙ্গ। নয়তো প্রাণ যে হাঁপিয়েওঠে—না কি বল ?

—ঠিক ঠিক।

—তাই ভাবলাম যদি পরামর্শ করতে হয় তবে ভায়ার ওখানে যাই। বাজে লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে কি হবে?তুমি যা বুদ্ধি দিতে পারবে, চাষাভুষো লোকের কাছ থেকেসে পরামর্শ পাবো না।

—জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েছে ?যুদ্ধের খবর কি?

—শুধু সিঙ্গাপুর কেন, ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েছে। জানো না সে খবর ?

—না—ইয়ে—শুনি নি তো ?ব্রহ্মদেশ ?সে তো—

—যেখান থেকে রেঙ্গুন চাল আসে রে ভায়া। ওই যেসস্তা, মোটা মোটা আলো চাল, সিদ্ধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই।

এ আবার এক নতুন খবর বটে। কাল বিশ্বাস মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করবার একটা জিনিস পাওয়া গেল বটে।উঃ, এ খবরটা সে এত দিনে জানে না?কেউ তো বলেও নি।জানেই বা কে এ অজ চাষা-গাঁয়ে ?তবে গঙ্গাচরণের কাছেসবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া। রেঙ্গুন বা ব্রহ্মদেশ ঠিক কোন্‌দিকে তা সে জানে না। পুব বা দক্ষিণ দিকে কোন্ জায়গায় ?অনেক দূর ?

পরদিন দুপুরবেলাতেও দুর্গা পণ্ডিত এখানেই আহার করলে। অনঙ্গ-বৌ তার জন্য দু'তিন রকমের তরকারি রান্নাকরলে। খেতে ভালোবাসে, ব্রাহ্মণ অতিথি। তাদের চেয়েঅনেক গরিব।

অনঙ্গ-বৌ হাবুকে সকালে উঠেই বলেচে—একটা মোচানিয়ে আয় তো তোর সয়াদের বাগান থেকে।

স্ত্রীকে মোচা কুটতে দেখে গঙ্গাচরণ বললে—আজ যেঅতিথি সৎকারের খুব বহর দেখচি—

—ভারি তো ! একটু মোচার ঘণ্ট রাঁধবো। আর একটুসুক্তুনি—

—বেশ বেশ। অতিথির দোহাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেআমাদেরও হয়ে যাবে।

—হ্যাঁগো, পণ্ডিত মশাই বড় গরিব, না ?দেখে বড় কষ্ট হয়। কি রকম কাপড় পরে এয়েচে, পায়ে জুতো নেই!

—তা অবস্থা ভালো হলে কি সাত টাকা মাইনেতে পড়েথাকে পাঠশালায় ?আজ ওকে একটু ভালো করে খাওয়াও।

—একটু দুধ যোগাড় করে দেবে ?

—দেখি যদি নিবারণ ঘোষের বাড়িতে মেলে। ওটা কাঁচকলার মোচা নয় তো, তাহলে কিন্তু এত তেতো হবে যে মুখে দেওয়া যাবে না তরকারি।

—নাগো, এ কাঁটালি কলার মোচা। আমাকে তুমি আমারকাজ শেখাতে এসো না বলছি।

দুপুর বেলা দুর্গা পণ্ডিত খেতে এসে সপ্রশংস বিস্ময়েরদৃষ্টিতে পাতের দিকে চেয়ে বললে—এ যে রীতিমতো ভোজের আয়োজন করেছেন দেখচি। আহা, বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এতসব রেঁধেচেন বসে বসে ?ওমা, কোথায় গেলে গো মা ?

অনঙ্গ-বৌ ঘরে ঢুকে সকুণ্ঠিত সলজ্জভাবে মুখ নীচু

করে রইল।

দুর্গা পণ্ডিত ভালো করে মোচার ঘন্ট দিয়ে অনেকগুলো ভাত মেখে গোগ্রাসে খেতে খেতে বললে—সত্যি, এমন তৃপ্তির সঙ্গে কতকাল খাই নি।

গঙ্গাচরণের মনে হল পণ্ডিত কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলচে।ওর স্বরে কপট ভদ্রতা নেই। সত্যি কথাই বলচে ও, এমন কি অনেক দিন পরে ও যেন আজ পেট ভরে দুটিভাত খেতে পেলে।।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও হাবু, বল আর কি দেবো ?মোচারঘন্ট আর একটু আনি ?

পরিশেষে ঘন জ্বাল দেওয়া এক বাটি দুধ আর নতুনআখের গুড়। দুর্গা পণ্ডিত সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছে, খাওয়ার সময় ওর চোখ দুটো যেন কেমন ধরনের চকচক করচে। শীর্ণ চেহারা শুধু বোধ হয় না খেয়ে খেয়ে। অনঙ্গ-বৌয়ের মনে মমতা জন্মালো। তাদের যদি অবস্থাথাকতো দেবার, ইচ্ছে হয় রোজ এই অনাহার-শীর্ণ দরিদ্রপণ্ডিত মশাইয়ের পাতে এমনিতর নানা ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতেদেয়।

—আসি বৌমা, আপনাদের যত্নের কথা ভোলবো না কখনো। বাড়ি গিয়ে মনে রাখবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

—যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁইদিয়ে মা অন্নপূর্ণা। বড্ড গরিব আমি।

দুর্গা পণ্ডিতের অপস্রিয়মাণ ক্ষীণদেহ আম-শিমুলের বনের ছায়ায় দূর থেকে দূরান্তরে গিয়ে পড়লো অনঙ্গ-বৌয়ের স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে।

সেদিন এক বিপদ।

রাধিকানগরের বাজারে পরদিন বহুলোকের সামনে পাঁচুকুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ হল। দিনমানে এমন ধরনের ব্যাপার এ সব অঞ্চলে কখনো ঘটে নি। গঙ্গাচরণও সেখানে দাঁড়িয়ে। একটা বটতলায় বড় আটচালাওয়ালা দোকানটা। প্রথমে লোকে সবাই এলো চাল কিনতে, তারপর কিসে যে কি হল গঙ্গাচরণজানে না, হঠাৎ দেখা গেল যে দোকানের চারিপাশে একটাহৈচৈ গোলমাল। মেলা লোক দোকানে ঢুকচে আর বেরুচ্চে।ধামা ও থলে হাতে বহুলোক মাঠ ভেঙে বাঁওড়ের ধারে-ধারেরপথে পড়ে ছুটচে। সন্ধ্যার দেরি নেই বেশি, সূর্যদেব পাটেবসে-বসে। গাছের মগডালে রাঙা রোদ।

একজন কে বললে—উঃ, দোকানটা কি করেই লুঠ হচ্চে !

গঙ্গাচরণও গিয়েছিল চাল কিনতে। হাতে তার চটেরথলে। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরে সে দেখলে চালের বাজারেসাড়ে বারো টাকা দর। গত হাটবারেও ছিল দশ টাকা চারআনা, একটা হাটের মধ্যে মণে একেবারে নসিকে চড়ে যাবে এ তো স্বপ্নের অগোচর। চাল কিনবে কি না-কিনবে ভাবছে, এমন সময় বিষম হৈচৈ।

লোকের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটচে। কেউ চাল নিয়ে ছুটচে, কেউ শুধু হাতে।গঙ্গাচরণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ভাবচে তখনো, চাল কিনবেকিনা—এমন সময় পেছন থেকে দু'জন লোক এসে ওর ঘাড়ের ওপর পড়লো, তার মধ্যে একজন ওকে জাপটে ধরলে জোর করে ওর চটের থলে সুদ্ধ। গঙ্গাচরণ চমকে উঠে বললে—কে ?কে ?

কর্কশ কণ্ঠে কে একজন অস্পষ্ট দিবালোকে বলে উঠলো—চাল নিয়ে পালাচ্চো শালা-হাতে-নাতে ধরেচি !

গঙ্গাচরণ কাঁকি মেরে উঠে বললে—কে চাল চুরিকরেচে ?লোক চেনো না ?

লোক দুজন ওর সামনে এসে ভালো করে মুখ দেখলে। গঙ্গাচরণ চিনলে ওদের, বন্যেবেড়ের দফাদার সাধুচরণ মণ্ডল এবং ঐ ইউনিয়নের জনৈক চৌকিদার। ওরা কিন্তু গঙ্গাচরণকেচেনে না।

চৌকিদার বললে—শালা, লোক সবাই ভালো। সকলকেই আমরা চিনি। চাল ফেললি কনে ?

—আমার নাম গঙ্গাচরণ পণ্ডিত, নতুন গাঁয়ে আমারপাঠশালা। চাল কিনতে এসেছিলাম বাপু, ব্রাহ্মণকে যা তাবোলো না। আমায় সবাই চেনে এ দিগরে। ছেড়ে দাও—

সাধুচরণ দফাদার ওর সামনে এসে মুখ ভালো করে দেখে বললে—এ দেখচি পুরানো দাগী চোর। এর নাম মনে পড়চে না, বাঁধো একে।

ঠিক সেই সময় নতুন গাঁয়ের তিনজন লোক এসে পড়াতে গঙ্গাচরণ দাগী চোর ও চুরির অভিযোগ থেকে নিস্তার পেলে। এমন হাঙ্গামে গঙ্গাচরণ কখনো পড়ে নি জীবনে।

গঙ্গাচরণের ফিরতে রাত হয়ে গেল সেদিন—অনঙ্গ-বৌ বসে আছে চালের আশায়। এত রাত কখনো হয় না হাটকরতে যেয়ে। ব্যাপার কি ?

বিনোদ কাপালীর বোন ভানু এসে বললে—কি করচোঠাকরুণ দিদি ?

—এসো ভানু। বোসো ভাই—

—দাদাঠাকুর কনে ?

—রাধিকানগরের হাটে গিয়েচে, এখনো আসবার নামটি নেই।

—আজ নাকি খুব হ্যাংনামা হয়ে গিয়েছে হাটে। দাদাফিরে এয়েছে, তাই বলছেল।

অনঙ্গ-বৌ উদ্বিগ্ন মুখে বললে—কি হ্যাংনামা রে ভানু ?হয়েছে কি ?

ভানু বললে—কি নাকি চালের দোকান লুঠ হয়েছে, অনেক লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে—এই সব।

অনঙ্গ-বৌ আশ্বস্ত হল, তার স্বামী লুঠের ব্যাপারে কখনোথাকবে না, সুতরাং পুলিশে ধরেও নিয়ে যায় নি, হয়তো ওই সব দেখতে দেরি করে ফেলেচে। তবুও সে হাবুকেডেকে বললে—ও হেবো, একটু এগিয়ে দেখ না—হাট থেকে লোকজন ফিরে এলো। এত দেরি হচ্ছে কেন?

এমন সময় শূন্য চালের থলে হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ি ঢুকেবললে—ওঃ, কি বিপদেই আজ পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকেকিনা ধরেচে চোর বলে !

অনঙ্গ বলে উঠলো—সে কি গো ?

—হা, ওই বন্যেবেড়ের সাধুচরণ দফাদার আর দু ব্যাটাচৌকিদার।

—ওমা, তারপর ?

—তারপর বাঁধে আর কি। শেষে এ গাঁয়ের লোকজনগিয়ে না পড়লে বেঁধে নিয়ে যেতো।

—কি সব্বোনাশ গা ! মা সাত-ভেয়ে কালীর পুজো দেবোস পাঁচ আনা। মা রক্ষা করেছেন।

—যাক সে তো গেল এক বিপদ, ইদিকে যে তার চেয়েও বিপদ। চাল পেলাম না হাটে।

—তুমি ভেবো না, আমি রাতটা চালিয়ে দেবো একরকমে। কাল দুপুরেও চালাবো। সারাদিনে চাল যোগাড় করেআনতে পারবে এখন খুবই।

বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ভানুকে বললে—ভানু দিদি, আমায় এক পালি চাল ধার দিতে পারবে আজ রাতেরমতো ?উনি হাটে গিয়ে হ্যাংনামাতে পড়ে গিয়েছিলেন, চালকিনতি পারেন নি।

ভানু বললে—এখুনি পেঠিয়ে দিচ্চি ঠাকরুণ দিদি।

—না দিলে কিন্তু রাতে ভাত হবে না।

—ওমা, সে কি কথা ঠাকরুণ দিদি, নয়তো আমি নিজেনিয়ে আসছি।

ভানু চলে গেল বটে কিন্তু চাল নিয়ে এল না। এই আসেএই আসে করে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তখনো ভানুরদেখা নেই। অনঙ্গ-বৌ আশ্চর্য হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি ?এইগ্রামে এসে পর্যন্ত যার কাছে যা মুখ ফুটে চেয়েচে সে, তক্ষুনিপরম খুশির সঙ্গে সে জিনিসটা এনে দিয়ে যেন কৃতার্থ হয়েগিয়েছে।এই প্রথমবার অনঙ্গ-বৌকে সামান্য এক কাঠা চাল ধার চেয়ে বিফল হোতে হল।

এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, স্বামী হাট থেকে এসে কোথায় যে বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় হাটের গল্প বলবারজন্যে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ি, কি করেই বা তাঁকে সে জানায় ?এসে খিদের ওপর ভাত খেতে পাবে না।

সাতপাঁচ ভাবছে, এমন সময় ভানু উঠোন থেকে ডাকলে—ও ঠাকরুণ দিদি ?

অনঙ্গ-বৌয়ের প্রাণ এল ফিরে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে—বলি কি কাণ্ডখানা, হ্যাঁ রে ভানু।

ভানু দাওয়ায় উঠে এসে শুকনো মুখে বললে-ঠাকরুণদিদি, আমি সেই থেকে চাল যোগাড় করবার জন্যে তিন-চারবাড়ি ঘুরে বেড়িয়েচি—

—কেন তোদের বাড়ি কি হল ?

—নেই। হাটে পায় নি আজ।

—হাটে কেন ?ক্ষেতের ধান ?

—আ মোর কপাল ! ক্ষেতের ধান আর কনে ! ছ'টাকামণ যেমন হল, অমনি কাকা সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়িপুরে। বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে এনলে। ফি-জনে জুতোকেনলে, কাপড় কেনলে, কাকীমা ঘটি বাসন কেনলে, মাছখালে, সন্দেশ খালে, মাংস খালে। নবাবি করে সে টাকাওউড়িয়ে ফেললে। এখন সে ধানও নেই, সে টাকাও নেই।ক’হাট কিনে খাতি হচ্ছে মোদেরও।

—অন্য বাড়ি যে ঘুরলি বললি ?

—মোদের পাড়ায় কারো ঘরে ধান নেই ঠাকরুণ দিদি। সব কিনে খাওয়ার ওপর ভরসা।।

ভানু আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে বললে।

—ওতে কি রে ?

—এক খুঁচি মোটা চাল ওই ক্ষুদে গয়লার নাত-বৌয়েরকাছ থেকে চেয়েচিন্তে

—হ্যাঁ রে, তারা তো বড় গরিব। তুই আনলি, তাদেরখাবার আছে তো ?দাঁড়া—

—সে আমি না জেনে আনি নি দিদি ঠাকরুণ। ওরালোকের ধান ভানে কিনা ?আট কাঠা ধানে এক কাঠা ধান বানি পায়। বানির ধান ভেনে খোরাকি চালায়।

অনঙ্গ-বৌ একটু ভেবে বললে—আমার একটা উপকার করবি ভানু ?

—কি ?

—আচ্ছা সে পরে বলবো এখন। দে চাল ক'টা।

—এক খুঁচি চালি রাতটা হবে এখন তো ?আর না হলিই বা কি করবা ঠাকরুণ দিদি ?কত কষ্টে যে চাল ক'ডা যোগাড়করে এনিচি তা আমিই জানি।

গঙ্গাচরণ ভাত খেতে বসলো অনেক রাতে। ডাল, ভাত আর পুঁইশাকের চচ্চড়ি। বাড়ির উঠোনেই সুগৃহিণী অনঙ্গ-বৌপুঁইমাচা তুলে দিয়েছে, লাউমাচা তুলেছে, কিছু ঢেঁড়শ, কিছুনটেশাকের ক্ষেত করেছে। হাবু ও নিজে দুজনে মিলে জলদিয়েছে আগে আগে, তবে এই সব গাছ বেঁচে আজ তরকারিযোগাচ্ছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—আর দুটো ভাত মেখে নাও, ডালদিয়ে পেট ভরে খাও—

—এ চাল দুটো ছিল বুঝি আগের দরুন ?

—হুঁ।

—কাল হবে ?

—কাল হবে না। সকালে উঠেই চাল যোগাড় করো।রাতটা টেনেটুনে হয়ে গেল।

—সেই বিশ্বাস মশায়ের দরুন ধানের চাল?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ স্বামী-পুত্রকে পেটভরে খাইয়ে সে-রাতে এক ঘটি জল আর একটু গুড় খেয়ে উপোস করে রইলো।

দিন পনেরোকেটে গেল।

গ্রামে গ্রামে লোকে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেচে। চাল পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়েছে।

রাধিকানগরের হাটে, যেখানে আগে বিশ-ত্রিশখানাগ্রামের চাষাদের মেয়েরা ঢেঁকি ভানা চাল নিয়ে আসতো, সেখানে আজকাল সাত-আটজন স্ত্রীলোক মাত্র দেখা যায়। তাওচাল পাওয়া যায় না। বড়তলার মোড়ে আর ওদিকে সামটাবিলের ধারে ক্রেতার দল ভিড় পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চাল কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা চাল বড় একটা পায় না।

আজ দু' হাট আদৌ চাল না পেয়ে গঙ্গাচরণ সতর্ক হয়ে এসে সামটা বিলের ধারে দাঁড়িয়েচে একটা বড় জিউলিগাছের ছায়ায়। সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন লোক আছে বিভিন্নগ্রামের। বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে, রোদ খুব চড়া।

কয়রা গ্রামের নবীন পাড়ুই বলচে—বাবাঠাকুর, আমরাতো ভাত না খেয়ে থাকতি পারি নে, আজ তিন দিন ঘরেচাল নেই।

গঙ্গাচরণ বললে—আমার ঘরে আজ দু'দিন চাল নেই।

আর একজন বললে—আমাদের দু'দিন ভাত খাওয়া হয় নি।

নবীন পাড়ুই বললে—কি খেলে ?

—কি আর খাবো ?ভাগ্যিস মাগীনরা দুটো চিঁড়ে কুটেরেখেছিল সেই বোশেখ মাসে, তাই দুটো করে খাওয়া হচ্চে।ছেলেপিলে তো আর শোনবে না, তারা ভরপেট খায়, আমরাখাই আধপেটা।

—তা চিঁড়ের সেরও দেখতি দেখতি হয়ে গেল বারোআনা, যা ছিল দু'আনা।

—এ কি বিশ্বেস করতি পারা যায়?কখনো কেউ দেখেচেনা শুনেচে যে চিঁড়ের সের বারো আনা হবে ?

গঙ্গাচরণ বললে—কখনো কি শুনেচে যে চালের মণযোল টাকা হবে ?

নবীন পাড়ুই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। সেজোয়ান মানুষ যদিও তার বয়েস ঠেকেচে পঞ্চাশের কোঠায়; যেমন বুকের ছাতি, তেমনি বাহুর পেশী। ভূতের মতো পরিশ্রম করেও যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, তবে আর বেঁচে সুখকি ?আজ দু-তিন দিন তাই জুটেচে ওর ভাগ্যে।

এমন সময় দেখা গেল আকাইপুরের মাঠের পথ বেয়েতিন-চারটি স্ত্রীলোক চালের ধামা, কেউ বা বস্তা মাথায় বড় রাস্তায় এসে উঠলো।

সবাই এগিয়ে চললো অমনি।

মুহূর্তমধ্যে উপস্থিত পাঁচ-ছ'জনের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কে কতটা চাল কিনতে পারে ! হঠাৎওদের মধ্যে কার যেন মনে পড়লো কথাটা, সে জিগ্যেসকরলে—কত করে পালি ?

একজন চালওয়ালী বললে—পাঁচ সিকে।

গঙ্গাচরণ এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল, পাঁচ সিকে পালি, অর্থাৎ কুড়ি টাকা মণ।

নবীন পাড়ুইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল, সে একটা টাকাএনেছে—পাঁচ সিকে না হলে এক কাঠা চাল কেউ বিক্রিকরবে না। এক টাকার চাল কেউ দেবে না।

এরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেও দেখলে যে চালযদি সংগ্রহ করতে হয় তবে এই বেলা। বিলম্বে হতাশ হতে হবে। আরো পাঁচ-ছ'জন ক্রেতাকে দূরে আসতে দেখা যাচ্চে।

দু'জন লোক এদের মধ্যে নিরুপায়। ওদের হাতে বেশি পয়সা নেই। সুতরাং চাল কিনবার আশা ওদের ছাড়তে হল।এই দলে নবীন পাড়ুই পড়ে গেল।

গঙ্গাচরণ বললে—নবীন, চাল নেবে না?

—না বাবাঠাকুর, একটা সিকি কম পড়ে গেল।

—তবে তো মুশকিল। আমার কাছেও নেই যে তোমাকেদেবো।

—আধসের পুঁটিমাছ ধরেলাম সামটার বিলে। পেয়েলামছ'আনা। আর কাল মাছ বেচবার দরুন ছেল দশ আনা।কুড়িয়ে-বুড়িয়ে একটা টাকা এনেলাম চাল কিনতি। তা আবারচালের দাম চড়ে গেল কি করে জানবো ?

—তাই তো !

—আধপেটা খেয়ে আছি দু'দিন। চাষিদের ঘরে ভাত আছে, আমাদের তা নেই। আমাদের কষ্ট সকলের অপেক্ষা বেশি। জলের প্রাণী, তার ওপর তো জোর নেই?ধরা না দিলে কি করছি! যেদিন পালাম সেদিন চাল আনলাম, যেদিন পালাম না সেদিন উপোস। আগে ধান চাল ধার দিতো, আজকালকেউ কিছু দেয় না।

গঙ্গাচরণ কাঠা দুই চাল সংগ্রহ করেছিল কাড়াকাড়ি করে।তার ইচ্ছে হল একবার এই চাল থেকে নবীন পাড়ুইকে সেকিছু দেয়। কিন্তু তা কি করে দেওয়া যায়, চালের অভাবেহয়তো উপোস করে থাকতে হবে কালই। গ্রামে ধান চালমেলে না যে তা নয়, মেলে অতি কষ্টে। ধান চাল থাকলেওলোকে স্বীকার করতে চায় না সহজে।

নবীন পাড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাচরণ রাধিকানগরের বাজারে এল। এক টাকার চালই কিনে দেবে তাকে। দোকানছাড়া তো হবে না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার, বড় বড়তিন-চারটি দোকান খুঁজে বেড়ালে, সকলেরই এক বুলি—চালনেই।

গঙ্গাচরণের মনে পড়লো বৃদ্ধ কুণ্ডুমশায়ের কথা। এই গত বৈশাখ মাসেও কুণ্ডু মশায়ের দোকানের সামনে দিয়েযাচ্চে সে, কুণ্ডু মশাই তাকে ডেকে আদর করে তামাক সেজেখাইয়ে বলছে—পণ্ডিত মশাই, আমার দোকান থেকে চালনেবেন, ভালো চাল আনিয়েচি। কত খাতির করেছে।

কুণ্ডু মশায়ের দোকানে গেলে ফিরতে হবে না, ঠিক পাওয়া যাবেই। কিন্তু সেখানেও তথৈবচ, গঙ্গাচরণদোকানঘরটিতে ঢুকবার সময় চেয়ে দেখলে বাঁ পাশের যেবাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে, সেজায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে।

বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায় প্রণাম করে বললে—আসুন, কি মনেকরে ?

অভ্যর্থনার মধ্যে বৈশাখ মাসের আন্তরিকতা নেই যেন। প্রণামটা নিতান্ত দায়সারা গোছের।

গঙ্গাচরণ বললে—কিছু চাল দিতে হবে।

—কোথায় পাবো, নেই।

—এক টাকার চাল, বেশি নয়। এই লোকটাকে উপোসকরে থাকতে হবে। দিতেই হবে আপনাকে।

কুণ্ডু মশায় সুর নিচু করে বললে—সন্ধের পর আমারবাড়িতে যেতে বলবেন, খাবার চাল থেকে এক টাকার চালদিয়ে দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ বললে—ধান চাল কোথায় গেল ?আপনারএত বড় দোকানের মাচা একদম ফাঁকা কেন ?

—কি করবো বাপু, সেদিন পাঁচুকুণ্ডুর দোকান লুঠ হবার পর কি করে সাহস করে মাল রাখি এখানে বলুন। সবারই সেদশা। তার ওপর শুনচি পুলিশে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্যে।

—কে বললে ?

—বলচে সবাই। গুজব উঠেছে বাজারে। আপনার কাছেমিথ্যে বলবো না, চাল আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে রেখে দিইচি।কিন্তু লোকের কাছে কবুল যাবো না, আপনাকে তাই বললাম, অন্যকে কি বলি ?

—আমরা না খেয়ে মরবো ?

—যদিন থাকবে, দেবো। তবে আমার জামাই গরুরগাড়িকরে বদ্দিবাটির হাটে কিছু চাল নিয়ে যেতে চাইছে। তাইভাবছি।

—পাঠাবেন না, লুঠ হবে পথে। বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে ! কি খেয়ে বাঁচবেমানুষ ?

—বুঝি সব, কিন্তু আমি একা রাখলি তো হবে না। খাঁ বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েচে গবর্নমেন্টের কন্ট্রাকটারদের কাছে। এক দানা ধান রাখে নি। এই রকম অনেকেই করেচে খবর নিয়ে দেখুন। আমি তো চুনোপুঁটি দোকানদার, পঞ্চাশ-ষাট মণ মাল আমার বিদ্যে।

গঙ্গাচরণ সন্ধ্যার অন্ধকারে চিন্তান্বিত মনে বাড়ির পথেচললো।

নবীন পাড়ুই সঙ্গেই ছিল, তাকে যেতে হবে দোমোহানী, নতুন গাঁয়ের পাশেই। বললে—পণ্ডিত মশাই ছেলেন তাইআজ বাচকাচের মুখে দু'টো দানা পড়বে। মোদের কথা ওসব বড় দোকানদার কি শোনে ! মোরা হলাম টিকরি মানুষ। কাল দু'টো মাছ পেটিয়ে দেবো আনে।

গঙ্গাচরণ বাড়ি নেই, পাঠশালায় গিয়েচে পড়াতে। হাবু ও পটল বাপের সঙ্গে পাঠশালায়।একা অনঙ্গ-বৌ রয়েছে বাড়িতে। কে এসে ডাক দিলে—ও পণ্ডিত মশাই—বাড়িতেআছ গা—

অনঙ্গ-বৌ কারো সামনে বড় একটা বার হয় না। বৃদ্ধব্যক্তি ডাকাডাকি করছে দেখে দোরের কাছে এসে মৃদুস্বরেবললে—উনি বাড়ি নেই। পাঠশালায় গিয়েছেন—

—কে ?মা-লক্ষ্মী ?

অনঙ্গ সলজ্জভাবে চুপ করে রইল।

বৃদ্ধটি দাওয়ায় উঠে বসে বললে— আমায় একটু খাবারজল দিতি পারবা মা-লক্ষ্মী ?

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে এক ঘটি জল নিয়ে এসে রাখলে। তারপর বাড়ির গামছাখানা বেশ করে ধুয়ে ঘটির ওপর রেখে দিলে। একটু আখের গুড় ও এক গ্লাস জলও নিয়ে এল।

বললে—দু'কোষ কাঁটাল দেবো ?

—খাজা না রসা ?

—আধখাজা। এখন শ্রাবণ মাসে রসা কাঁটাল বড় একটা থাকে না।

—দাও, নিয়ে এসো—মা, একটা কথা

—কি বলুন ?

আমি এখানে দু'টো খাবো। আমি ব্রাহ্মণ। আমার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। বাড়ি কামদেবপুরের সন্নিকট বাগান-গাঁ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—খাবেন বই কি। বেশ, একটু জিরিয়ে নিন। ঠাই করে দি—

একটু পরে দীনু ভট্চায মোটা আউশ চালের রাঙা ভাত, ঢেঁড়শভাজা, বেগুন ও শাকের ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিরসঙ্গে খাচ্ছিল। অনঙ্গ-বৌবিনীত ভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু খেতে খেতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন একটু দম নিলে।তারপর বললে—মা-লক্ষ্মীর রান্না যেন অমর্তো। চচ্চড়ি আরএকটু দাও তো ?

অনঙ্গ লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে বললে—আর তো নেই !ঢেঁড়শভাজা দুখানা দেবো ?

—তাই দাও মা।

এত বৃদ্ধ লোক যে এতগুলো ভাত এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলতে পারে, অনঙ্গ-বৌ নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাসকরতো না। বললে—আর ভাত দেবো ?

—তা দুটো দাও মা।

—মুশকিল হয়েছে, খাবেন কি দিয়ে ! তরকারি বাড়ন্ত।

—তেঁতুল এক গাঁট দিতি পারবা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমরা হলাম গিয়ে গরিব মানুষ। সব দিন কিমাছ-তরকারি জোটে ?কোনো দিন হল না, তেঁতুল এক গাঁট দিয়ে এক পাত্তর ভাত মেরে দেলাম।

অনঙ্গের ভালো লাগছিল এই পিতার বয়সী সরল বৃদ্ধের কথাবার্তা। ইনি বোধ হয় খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। বলতে নেই, কি রকম গোগ্রাসে ভাত কটা খেয়ে ফেললেন। আরো থাকলে আরো খেতে পারতেন বোধ হয়। কিন্তু বড্ড দুঃখের বিষয়, ভাত-তরকারি আর ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অনঙ্গবললে—তামাক সেজে দেবো ?

—তোমাকে দিয়ে তামাক সাজাবো মা-লক্ষ্মী ?না না, কোথায় তামাক বলো। আমি নিজে বলে তামাক সাজতি সাজতি বুড়ো হয়ে গেলাম। ঊনসত্তর বছর বয়েস হল।

—ঊনসত্তর ?

—হ্যাঁ। এই আশ্বিন মাসে সত্তর পোরবে। তোমরা তো আমার নাতনীর বয়সী।

দীনু ভট্চাযহ্যা-হ্যা করে হেসে উঠলো কথার শেষে।

অনঙ্গ-বৌ নিজেই তামাক সেজে কল্কেয় ফু দিতে দিতেএল, ওর গাল দুটি ফুলে উঠেচে, আগুনের আভায় রাঙাহয়ে উঠেচে।

দীনু শশব্যস্তে বললেন—ওকি, ওকি,—এই দ্যাখোমা-লক্ষ্মীর কাণ্ড !

—তাতে কি ?এই তো বললেন—আমাকে নাতনীর সমবয়সী।

—না না, ওটা ভালো না। মা-লক্ষ্মী তুমি কেন তামাক সাজবে ?ওটা আমি পছন্দ করি নে—দ্যাও হুঁকো আমার হাতে।ফুঁ দিতে হবে না।

অনঙ্গ-বৌ একটা মাদুর ও বালিশ নিয়ে এসে পেতেদিয়ে বললে—গড়িয়ে নিন একটু।

বেলা পাঁচটার সময় পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ বাড়িফিরে কে একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে কিছু বুঝতে পারলে না। পরে স্ত্রীর কাছে সব শুনে বললে—ও, কামদেবপুরের সেই বুড়ো ভট্চায ?চিনেচিএবার। কিন্তু তুমি তা হলে না খেয়ে আছ ?

অনঙ্গ বললে—আহা, আমি তো যা-তা খেয়েই একবেলা কাটাতে পারি। কিন্তু বুড়ো বামুন, ওর না-খাওয়ার কষ্টটা—

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু যা-তা খেয়ে যে কাটাবে— যা-তা ঘরে ছিলই বা কি ?

—তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

স্ত্রীকে গঙ্গাচরণ খুব ভালো করেই জানে। ওর সঙ্গেমিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতে ও চিরকাল অভ্যস্ত। অথচ মুখ ফুটে বলবে না কখনোকি খেয়েচে না খেয়েছে। এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড়মুশকিলের কাণ্ড। কত কষ্টে গত হাটে চাল যোগাড় করেছিল সে-ই জানে।

ইতিমধ্যে দীনু ভট্চায ঘুম ভেঙে উঠে বসলো। বললে— এই যেপণ্ডিত মশাই !

গঙ্গাচরণ দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার।ভালো ?

দীনু হেসে বললে—মা-লক্ষ্মীর হাতে অন্ন খেয়ে আপাতোক খুবই ভালো। বড্ড জমিয়ে নিয়েচি। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—ওর মাথাটি খেলে কেউ লক্ষ্মী, কেউ অন্নপূর্ণা বলে। আমি এখন মাঝে পড়ে মারা যাই।

মুখে বললে—হেঁ হেঁ, তা বেশ—তা আর কি—

—কোথা থেকে ফিরলেন ?

—পাঠশালা থেকে।

—আমি একটু বিপদে পড়ে পরামর্শ করতে এলাম পণ্ডিতমশায়।

—কি বলুন ?

—বলবো কি, বলতি লজ্জা হয়। চাল অভাবে সপুরীউপোস করতে হচ্ছে। কম দুঃখে পড়ে আপনার কাছে আসি নি।

—কামদেবপুরে মিলছে না ?

—আমাদের ওদিকি কোনো গাঁয়ে না। আর যদিও থাকেতা দেড় টাকা করে কাঠা বলচে। এ কি হল দেশে? আমার বাড়িচার-পাঁচজন পুষ্যি। দেড় টাকা চালের কাঠা কিনে খাওয়াতেপারি আমি ?

—এদিকেও তো ওই রকম ভট্চায মশায়। আমাদেরগাঁয়েও তাই।

—বলেন কি ?

—ঠিক তাই। ও হাটে অতি কষ্টে দু’কাঠা চাল কিনেএনেছিলাম।

—ধান ?

—ধান কেউ বিক্রি করচে না। করলেও ন'টাকা সাড়েন'টাকা মণ।

—এর উপায় কি হবে পণ্ডিত মশায়? আপনি বসুন, সেই পরামর্শ করতি তো আমার আসা। সত্যি কথা বলতি কিআপনার কাছে, কাল রাতি আমার খাওয়া হয় নি। চাল ছিলনা ঘরে। মা-লক্ষ্মীর কাছে অন্ন খেয়ে বাঁচলাম। বুড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহ্যি করতে পারি নে আর।

—কি বলি বলুন, শুনে বড্ড কষ্ট হল। করবারও তোনেই কিছু। আমাদের গ্রামের অবস্থাও তথৈবচ।

দীনু ভট্চায দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বুড়ো বয়সেএবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখছি।

গঙ্গাচরণ বললে—তাই তো পণ্ডিত মশাই, কি যে করি, বুঝতে তো কিছু পারি নে। তা ছাড়া আপনাদের গাঁয়ের ব্যবস্থাএখান থেকে কি করে করা যাবে। কতটা চাল চান?চলুনদিকি একবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ি।

কিন্তু বিশ্বাস মশায়ের বাড়ি যাওয়া হবে কি, দীনু ভট্চায ম্লানমুখে বললে—তাই তো, পয়সাকড়ি তো আনি নি।

গঙ্গাচরণ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আনেন নি, তবেআর কি হবে ?কি করতে পারি আমি ?

গঙ্গাচরণ বোধ হয় একটু কড়া সুরে বলে ফেলেছিলকথাটা।

দীনু ভট্চায হতাশভাবে বললে—তাই তো, এবারডাদেখচি সত্যিই না খেয়ে মরতি হবে।

গঙ্গাচরণ ভাবলে—ভালো মুশকিল ! তুমি না খেয়েমরবে তা আমি কি করবো ?আমার কি দোষ ?

এই সময় অনঙ্গ-বৌ দোরের আড়াল থেকে হাতনাড়াদিয়ে গঙ্গাচরণকে ডাকলে।

গঙ্গাচরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বললে—কি বলছ ?

—জিজ্ঞেস করো উনি এখন দুখানা পাকাকাঁকুড় খাবেন?ঘরে আর তো কিছু নেই।

—থাকে তো দাও না। জিজ্ঞেস করতে হবে না। ফুটিকাঁকুড় কি দিয়ে দেবে ?গুড় বা চিনি কিছুই তো নেই।

—সে ব্যবস্থার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। সে আমিদেখচি। আর একটা কথা শোনো। উনি অমন দুঃখু করচেন বুড়ো বয়েসে না খেয়ে মরবেন বলে, তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদের বাড়ি এয়েচেন কেন, একটা হিল্লেহবে বলেই তো। আমি দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি।বুড়ো বামুন আমাদের বাড়ি থেকে শুধু হাতে শুধু মুখে ফিরেগেলে অকল্যাণ হবে না ?তাছাড়া যখন আমাদের আশা করেএতটা পথ উনি এয়েছেন, এর একটা উপায় না করলে হয় ?

গঙ্গাচরণ বিরক্ত মুখে বললে—কি উপায় হবে ?খালিহাতে এসেচে বুড়ো ! ও বড্ড ধড়িবাজ। একদিন অমনিকামদেবপুর থেকে ফিরবার পথে চালগুলো নিয়ে নিলে—

অনঙ্গ-বৌ জিভ কেটে বললে—ছিঃ ছিঃ—অতিথিনারায়ণ, আমার বাড়ি উনি এয়েচেন, আমাদের কত ভাগ্যি!ও কথাটি বোলো না। অতিথিকে অমন কথা বলতেআছে ?কাকে কি যে বলো ! নিয়েছেন চাল, নিয়েছেন। আমাদেরবাপের বয়িসী মানুষ। ওঁকে অমন বোলো না—

—তা তো বুঝলাম, বলবো না ! কিন্তু পয়সা না থাকলেচাল ধান পাবো কোথায় ?

—উনি কি বলেন দ্যাখো—

—উনি যা বললেন বোঝাই গিয়েচে। উনি এয়েচেনভিক্ষে করতে, সোজা কথা। মেগে পেতে বেড়ানোই ওঁরস্বভাব।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার ওই সব কথা?

—তা আমি কি করব এখন ? বলো তাই করি।

—শুধু হাতে উনি না ফেরেন। বাপের বয়িসী বামুন। নাহয় আমার হাতের পেটি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা এনে ওঁকে চাল কিনে দাও। দিতেই হবে, না দিলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। চাল তো আমাদেরও কিনতে হবে। রাতে রান্না হবে না।

গঙ্গাচরণ বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল, অনঙ্গ-বৌ বললে— পাকা কাঁকুড় দুখানা খেয়ে নাও। বেরিয়ো না।

গঙ্গাচরণ বিরক্তির সুরে বললে—আমি বিনি মিষ্টিতে ফুটি কাঁকুড় খেতে পারি নে। ওসব বাঙালে খাওয়া তোমরাখাও।

অনঙ্গ-বৌ সকৌতুকে হাসি হাসি চোখ নাচিয়েবললে—বাঙাল বাঙাল কোরো না বলচি, ভালো হবে না। আমি বাঙাল, আর উনি এসেচেন একেবারে মুক্‌সুদোবাদজেলা থেকে—

সে আবার কি গো ?ও কথা তুমি আবার কোথায়শিখলে ?

শিখতে হয় গো, শিখতে হয়। সেই যে ভাতছালায় উত্তুরে ঘরামি জন ঘর ছাইতে আসতো, মনে পড়ে ?ওরা বলতো না, মা, আমাদের বাড়ি মুক্‌সুদোবাদ জেলা—হি-হি-হি

একটু পরে বাইরের দাওয়ায় বসে দীনু ও গঙ্গাচরণদু'জনেই পাকা ফুটি কাঁকুড় খাচ্ছিল খেজুরগুড়ের সঙ্গে।কোথায় অনঙ্গ-বৌ একটু খেজুরগুড় লুকিয়ে সঞ্চয় করেরেখেছিল সময়-অসময়ের জন্যে। অনঙ্গ-বৌ ওই রকম রেখেথাকে। গঙ্গাচরণ জানে, অনেক সময় জিনিসপত্র ভেলকিবাজির মতো বার করে অনঙ্গ।

দীনু ভট্চায কঁসার বাটি থেকে গুড়টুকুচেটেপুটে খেয়েদীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আহা, খেজুরগুড়ের মুখ এবার আরদেখি নি।

গঙ্গাচরণ বললে—তা বটে।

—আগে আগে পণ্ডিত মশায়, গুড় আমাদের কিনতি হোত না। মুচিপাড়ায় বানে খেজুর রস জাল দিতো, ঘটি হাতেকরে গিয়ে দাঁড়ালি আধ সের এক সের গুড় এমনি খেতি দিতো। সে সব দিন কোথায় যে গেল।

গঙ্গাচরণ বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেই অনঙ্গ-বৌদাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—কাঁকুড় কেমন খেলেন— ?

—চমৎকার মা চমৎকার। তুমি সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, কিআর বলবো তোমায়। একটা কথা বলবো ?

—কি বলুন না?

-মা একটু চা করে দিতি পারো ?অনঙ্গ-বৌ বিপন্ন মুখে বললে—চা ?

—কতদিন চা খাইনি। মাসখানেক আগে সবাইপুরের গাঙ্গুলীবাড়ি গিয়ে একদিন চা খেয়েছিলাম। চা আমার বড্ডখেতি ভালো লাগে। আগে আগে বড্ড খ্যাতাম। এদানি হাতেপয়সা অনটন, ভাতই জোটে না বলে চা। আছে কি?

অনঙ্গ-বৌ ভেবে বললে—আচ্ছা, আপনি বসুন—

হাবুকে বাড়ির মধ্যে গিয়ে বললে—হারে, কাপাসীরমা'র বাড়ি ছুটে যা তো। আমার নাম করে বলগে, একটু চাদাও। যদি সেখানে না থাকে, তবে শিবু ঘোষদের বাড়ি যাবি। চা আনতি হবে বাবা।

হাবু বললে—ও বুড়ো কে মা ?

"যাঃ, বুড়ো বুড়ো কি রে ?ও রকম বলতে আছে ?বাড়িতে নোক এলে তাকে মেনে চলতে হয়, শিখে রাখো।

—হ্যাঁ মা, চা দিয়ে কি হবে? চিনি নেই যে—

তোর সে ভাবনার দরকার কি ?তুই যা বাপু, চা একটু এনে দে

আধঘণ্টা পরে প্রফুল্লবদনে দীনু ভট্চাযের সামনে হাসিহাসি মুখে চায়ের গ্লাস স্থাপন করে অনঙ্গ-বৌ বললে—দেখুনতো কেমন হয়েছে ?সত্যি কথা, চায়ের পাটাপাট তেমন তোনেই এ বাড়িতে। কেমন চা করলাম কে জানে ?

দীনু ভট্চায চা-পূর্ণ কাঁসার গ্লাস কেঁচার কাপড়ে জড়িয়েদু-হাতে ধরে এক চুমুক দিয়ে চোখ বুজে বললে—বাঃ, বেশবেশ মা-লক্ষ্মী—এই আমার অমর্তো। দিব্যি হয়েছে—

এই সময় গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললে—চলো, ওদিকে একটা কথা শোনো।

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে এসে নিচু সুরে বললে—কি ?

—চাল আনলাম এক কাঠা বিশ্বেস মশায়ের বাড়ি থেকেচেয়ে-চিন্তে। আর ধারে তিন কাঠা ধানের ব্যবস্থা করে এলাম।দীনু ভট্চাযকে কাল সকালে এনে দেবো। আজ আর বুড়োনড়চে না দেখছি, ও খাচ্চে কি ?চা নাকি ?কোথায় পেলে ?বুড়ো আছে দেখছি ভালোই। আর কি নড়ে এখান থেকে ?

—তোমার অত সন্ধানে দরকার কি ?তুমি একটু চাখাবে ?দিচ্চি। আর ওঁকে অমন বোলা না। বলতে নেই।বুড়ো বামুন অতিথি—ছিঃ—

গঙ্গাচরণ মুখ বিকৃতি করে অতিথির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকরলে। মুখে বললে—ওঃ, ভারি আমার অতিথি রে !

ধমক দিয়ে অনঙ্গ-বৌ বললে—ফের ?আবার ?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ি একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে গ্রামের অনেকগুলি লোক জুটেচে। ঘন ঘন তামাক চলছে।

হীরু কাপালী বলছে—আমাদের কিছু ধান দ্যান বিশ্বেসমশাই, নয়তো আমরা না খেয়ে মলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচ-ছ'জন লোক ওই এক কথাইবললে। ধান দিতে হবে, না দিলে তাদের পরিবারে অনাহারশুরু হবে।

বিশ্বাস মশাই বললেন—নিয়ে যাও গোলা থেকে। যাআছে, দু-পাঁচ আড়ি করে এক এক জনের হবে এখন। যতক্ষণ আমার আছে, ততক্ষণ তোমাদের দিয়ে তো যাই, তারপরযা হয়।

গঙ্গাচরণও ধানের জন্য দরবার করতে গিয়েছিল। তাকে বিশ্বাস মশায় বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনাকে কর্জ হিসেবে ধান আর কি দেবো ! পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে যান। কিন্তু এই শেষ, আর আমার গোলায় ধান নেই।

গঙ্গাচরণ বিস্মিত হল বিশ্বাস মশায়ের কথায়। যারগোলাভর্তি ধান, মাত্র এই কয় জন লোককে সামান্য কিছু ধান দিয়ে তার গোলা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ কেমনকথা হল ?

পথে তাকে হীরু কাপালী গোপনে বললে—বিশ্বেসমশায় ধান সব লুকিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়েছে পণ্ডিত মশাই। পাছে মোদের দিতি হয় সেই ভয়ে। দু'পৌটি ধান ধরে হাতিরমতো গোলা—ধান নেই কি রকম ?

—তোমরা তো ধান নিলে, কি রকম দেখলে গোলায় ?

—গোলা সাবাড় পণ্ডিত মশাই, নিজের চোকে দেখিএলাম। এক দানা নেই ওর মধ্যি।

—তাই তো !

—এবার এই ধান কটা ফুরুলি না খেয়ে মরতি হবে—

—কেন, ভাদ্র মাসের দশ-বারো তারিখের মধ্যে আউশধান পেকে উঠচে। ভাবনা চলে যাবে তখন।

—তাই কি হয় পণ্ডিত মশাই ?নতুন ধানের চাল খেলিসদ্য কলেরা। দেখবেন তাই লোকে খাবে পেটের জ্বালায় আরপট্ পট্ মরবে। ও চাল কি এখন খাওয়া যাবে, না পেটেসহ্যি হবে ?ও খেতি পারা যাবে কার্তিক অঘ্রাণ মাসের দিকি।

—তবে উপায় কি হবে লোকের ?

—এবার যে রকমডা দেখছি, না খেয়ে লোক মরবে।

কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হল না। না খেয়ে আবার লোক মরে ?কখনো দেখা যায় নি কেউ না খেয়ে মরেচে।জুটে যায়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশে লোকে না খেয়ে মরবে ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও কটা ধান আমি নিজেই ভেনে কুটে দেবো চেঁকিতে।ওর জন্যে আর কারো খোশামোদ করতে হবে না। কিন্তু ওতে কদিন চলবে ?

—তাই তো আমিও ভাবছি।

—আমি একটা কথা ভাবছি। অন্য লোকের চাল কেনআমি ভেনে দেই না ?বানি পাবো দু’কাঠা করে চাল মণে।

ছিঃ ছিঃ, দু’কাঠা চাল বানি দেবে তার জন্যে তুমি।দশ আড়ি ধান ভানতে যাবে ?অত কষ্ট করে দরকার নেই।

কষ্ট আর কি ?দু’কাঠা চালের দাম কত আজকাল।আমি তা ছাড়বো না। দু’কাঠা চাল বুঝি ফেলনা ?

—লোকে কি বলবে বল তো ?

—বলুক গে। আমার সংসারে যদি দু’কাঠা চালের সাশ্রয় হয় তবে লোকের কথাতে কি আসে যাচ্চে ?

—তুমি যা ভালো বোঝো কর, কিন্তু আমার মনে হচ্চে তোমার শরীরটিকবে না।

—সে তোমায় দেখতে হবে না।

তারপর অনঙ্গ-বৌ হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠেঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—তোমায় ঠকিয়েচি গো তোমায় ঠকিয়েচি।

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ঠকিয়েচ ?

—ঠকিয়েচি মানে চোখে ধুলো দিইচি।

—কেন ?

—কত দিন আগে থেকে আমি ধান ভানচি।

—সত্যি ?

—সত্যি গো সত্যি। নইলে চালের হিসেব নিয়ে দেখো। দু’কাঠা চাল তো হাট থেকে কিনেছিলে, কত দিন খেলে মনেনেই ?

—আমায় না জানিয়ে কেন অমন করছো তুমি ?ছিঃ ছিঃ -কাদের ধান ভানো ?

—হরি কাপালীদের। শ্যাম বিশ্বেসদের।

—ক’কাঠা চালের জন্যে কেন কষ্ট করা ! ওতে মান থাকে না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কাপালীদের ধান ভানা ?লোকে জানলে কি বলবে বল তো ?এত ছোট নজর তোমার হল কেমন করে তাই ভাবছি।

—বেশ, লোকে আমায় বলে বলবে, আমার ছেলেপুলেতো দুমুটো পেট ভরে খেতে পাবে। তা ছাড়া কাপালীদেরদুই বৌ ধান এলে দেয়। আমি শুধু চেঁকিতে পাড় দিই।

—তুমি ধান এলে দিতে পারো ?এলে দেওয়া বড় শক্তনা ?

—এলে দেওয়া শিখতে হয়। তাড়াতাড়ি গড় থেকে যেহাত উঠিয়ে নিতে পারে সে ভালো এলে দিতে পারে। এলেদেওয়ানো শিকচি একটু একটু।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথায় ভাবনায় পড়ে গেল। তার স্ত্রী যেতাকে লুকিয়ে এ কাজ করছে তা সে জানতো না। মাঝেমাঝে সে ভেবেচে অবিশ্যি, মাত্র দু’কাঠা এক কাঠা চালে তার এক হাট থেকে আর এক হাট পর্যন্ত চলচে কি করে?এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে অনঙ্গ-বৌ চালাচ্ছে তা তো সে জাতো না।

আহা, বেচারি ! যদি ধান এলে দিতে গিয়ে কোনোদিনওর আঙুলে ঢেঁকি পড়ে যায় ?

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বেরিয়ে গেলে ছবি কাপালীর ছোটবৌ এসে হেঁচতলায় দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বলে—উনি চলে গিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, দিদি। যাই—

—চলো বামুন-বৌ, ওরা সব বসে আছে তোমার জন্যি।

—কত ধান আজকে ?

—পাঁচ আড়ি তিন কাঠা। চিঁড়ে আছে তিন কাঠা।

—আমাকে ধান এলে দেওয়া শিখিয়ে দিবি দিদি ?

—সে তোমার কাজ নয়। অমন চাঁপাফুলের কলির মতোআঙুল, ঢেঁকি পড়ে ছেঁচে যাবে। তার দায়িক আমি হব বুঝিবামুন-বৌ ?

—দায়িক হতে হবে না সেজন্যি ?আহা, ভঙ্গি দেখোনা। মরণের ভগ্নদশা।

কাপালী-বৌ অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চোখ মিটকি মারছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করেই অনঙ্গ-বৌয়ের শেষের উক্তিটুকু। হরি কাপালীর ছোট বৌয়ের বয়েস অনঙ্গ অপেক্ষা বছর দুই বেশিহবে, ছেলেপুলে হয় নি, রংও ফর্সা, মুখ-চোখের চটক ওদেহের গড়ন এবং বাঁধুনি ভালোই। রাস্তার লোকে চেয়ে দেখে।

অনঙ্গ হেসেবললে—আড়চোখ দেখাগেঅন্য জায়গায়— বহুলোকের মুণ্ডুঘুরিয়ে দিতে পারবি।

কাপালী-বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি ! বললে—মুণ্ডু ঘুরিয়ে বেড়ানো বুঝি আমার কাজ ?

—কি জানি দিদি !

—আর তুমি বামুন—বৌ-তুমি যে অনেক মুনির মন টলিয়ে দিতে পারো মন করলি ?আমরা তো তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নই। সামনে খোশামোদ করে বলচি নে বামুন-বৌ, গ্রামের সবাই বলে—

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হাসিমুখে বললে—যাঃ

হরি কাপালীর দু'খানা মেটে ঘর, একদিকে পুঁইমাচা, একদিকে বেড়ার মধ্যে লাউডাটা ঝিঙে ও বেগুনের চাষ।পুঁইমাচার পাশে ছোট চালার নিচে ঢেঁকি পাতা। সেখানে জড়ো হয়েছে হরি কাপালীর বড়-বৌ, আরো পাড়ার দু-তিনটিঝি-বৌ। ঢেঁকিঘরের চারপাশে বর্ষাপুষ্ট বনকচুর ঝাড়, ধুতরো গাছ, আদাড় বাগ গাছে রাঙা রাঙা মটর ফল, ঢেঁকি ঘরেরচালে তেলাকুচো লতা উঠে ঝুলচে, বর্ষাসজল হাওয়ায় কচি লতাপাতার গন্ধ।

অনঙ্গ-বৌ আর ছোট-বৌ সেখানে পৌঁছাতে সবাই খুবখুশি।

বড়-বৌ বললে—এসো বামুন-বৌ, তুমি না এলিঢেঁশেলের মজলিশ আমাদের জমে না—

ক্ষিতুরী কাপালী বললে—যা বললে দিদি, ঠাকরুণ দিদি আমাদের ঢেঁশেল আলো করে থাকেন। আমাদের বুকির মধ্যি হু-হু করতি থাকে উনি না এলি—

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—তোমাদের বড় দরদ দেখছি—

ছোট-বৌ বললে—আমিও বলছিলাম, বামুন-বৌয়ের রাঙা পায়ের তলায় পড়ে আমি মরতি পারি—

বড় বৌ বললে—সে তো ভাগ্যি—বামুনের এয়িস্ত্রীবৌয়ের পায়ে মরবার ভাগ্যি চাই রে ছুটকি ! সে এমনি হয় না।

এদের দুপুরের মজলিশ জমে উঠলো।।

কাপালীপাড়ার বৌ-ঝিয়েদের এই একমাত্র আমোদ-আহ্লাদের স্থান। এখানে না এলে ওদের দুপুরটা মিথ্যে হয়ে যায় যেন। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরের মেয়ে, দুপুরে এদের দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই, সময়ও পায় না। ধান ভানা চিঁড়ে কোটাতেই অবসর সময় কেটে যায়, ওর মধ্যেই এদের আড্ডা, গল্পগুজবযা কিছু।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বড়-বৌ, ও ধান কাদের ?

—কাল উনি কোত্থেকে কত কষ্টে পাঁচ কাঠা ধানএনেলেন—কিন্তু শুনচি ধান নাকি সব গবরমেন্টে নিয়েযাচ্চে ?

—কে বললে ?

—উনি কাল হাট থেকে নাকি শুনে এয়েচেন।

ছোট-বৌ বললে—ওসব কথা এখন রাখো দিদি।বামুন-বৌয়ের জন্যে একটা পান সেজে নিয়ে এসো দিকি।

—পান আছে, সুপুরি নেই যে ?কাল হাটে একটা সুপুরিরদাম দু’পয়সা।

সিদ্ধেশ্বর কামারের বৌবললে—হাদিদি, নাকি আজকাল খেজুরের বীচি দিয়ে পান সাজা হচ্চে সুপুরির বদলে ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—সত্যি ?

কামার-বৌবললে—সত্যি মিথ্যে জানি নেঠাকরুণ-দিদি।মিথ্যে কথা বলে শেষকালে বামুনের কাছে নরকে পচেমরবো ?কানে যা শুনিচি—বললাম।

কথাশেষে সে হাতের এক রকম ভঙ্গি করে মৃদু হাসলো।

এইঢেঁকিশালের মজলিশে অনঙ্গ-বৌয়ের পরে দেখতে ভালো হরি কাপালীর ছোট-বৌ, তার পরেই এই কামার-বৌ।এর বয়েস আরো কম ছোট-বৌয়ের চেয়ে, রংও আরো একটু ফর্সা—তবে ছোট-বৌয়ের মুখশ্রী এর চেয়ে ভালো। কামার-বৌ সম্বন্ধে গ্রামে একটু বদনাম আছে, সে অনেকছেলেছোকরার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার জন্যে দায়ী, অনেককে প্রশ্রয়ও দেয়। কিন্তু ছোট-বৌ সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারে না। অনঙ্গ-বৌ বললে—পোড়া কপাল পান খাওয়ার !খেজুরের বীচি দিয়ে পান খেতে যাচ্চি নে।

ক্ষিত্তুরী কাপালী শুনে হেসে খুন হয় আর কি। সে বিনোদ মোড়লের বিধবা বোন, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস, আধফর্সাথান পরে এসেছে, দেখতে শুনতে নিতান্ত ভালোও নয়, খুবমন্দও নয়। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়া ওর একটা রোগেরমধ্যে গণ্য।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি পেল ক্ষিত্তুরীর হাসি দেখে।

হাসতে হাসতে বললে—নে বাপু থাম—তুই আবার জ্বালালি দেখচি—এত হাসিও তোর।

ছোট-বৌ ঠোঁট উল্টে বললে—ওই বোঝো।

ইতিমধ্যে বড়-বৌ কি ভাবে দুটো পান সেজে নিচু ঘরেরদাওয়ার ধাপ থেকে নামলো।

ছোট-বৌ বললে-বিনি সুপুরিতে দিদি ?

বড়-বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বলল—ওরে না না, খুঁজেপেতেঘর থেকে উটকে বার করলাম।

—কোথায় ছিল ?

—তোকে বলবো কেন ?

—কেন ?

—তুই সব্বস্ব উটকে বের করবি। তোর জ্বালায় ঘরে কিছু থাকবার জো আছে ?আমি যাই গিন্নি, তাই সব জিনিসযোগাড় করে তুলে লুকিয়ে রেখে দি, আর তুই সব উটকে উটকে বার করিস।

ছোট-বৌ চোখ পাকিয়ে ভুরু তুলে বললে—আমি ?

—হ্যাঁ, তুই। আমি কাউকে ভয় করে কথা বলবো নাকি ?তুই ছাড়া আর কে ?

—তুমি দেখেছ দিদি ?

—দেখিনি ! একশো দিন দেখেচি। বলি, ঘর বলতিদু'খানা বাতাসা রেখে দিইছিলাম, ওমা সেদিন দেখি নেইসেটুকু। তুই চুরি করে খেয়েচিস। কে ঘরে ঢুকতে গিয়েছেতুই ছাড়া ?ছেলেপিলের বালাই নেই যখন বাড়িতে ?

কথাটা বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যা নয়, কারণ এই কথারপর ছোট-বৌয়ের কথার সুর ও তেজ কমে গেল। সেবললে—খেইচি যাও, বেশ করিচি। আমার জিনিস না ?

বড্ড যে স্বত্ব দেখাচ্ছিস লা।

অনঙ্গ-বৌ বললে—আহা, কি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দু'বেলাতোমাদের ঝগড়া। থামো না বাপু।

বড়-বৌ বললে—আমি অন্যাই কথাটি কি বলিচি বামুন-বৌ তুমিই বিচের কর। ঘর বলে জিনিস লুকিয়ে রাখিএই যুজ্যের বাজারে। তুই সেগুলো উটকে উটকে চুরি করেখাস কেন ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও ছেলেমানুষ যে বড়-বৌ। তোমার মেয়ে হলে আজ অত বড় মেয়েই হোত। হোত না ?

—আমার মেয়ের পোড়াকপাল !

—ওমা সেকি, পোড়াকপাল কি ?ছোট-বৌ দেখতে সুশ্রী কেমন ?চেয়ে দেখতে পাও না ?দু'চোখের কি মাথা খেয়েছ ?

ছোট-বৌ হঠাৎ বড় নরম হয়ে গিয়েছিল। সে বললে— নাও নাও বামুন-বৌ, তোমার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে !

বড়-বৌ ছোট-বৌয়ের দিকে আড়চোখে খানিকক্ষণচেয়ে থেকে, মুখ চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতেবললে—আহা-হা ! বলি কত ঢং দেখালি লা !

ক্ষিতুরী কাপালী বড়-বৌয়ের চোখ মুখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে পুনরায় হেসে গড়িয়ে প্রায় ঢেঁকির গড়ের উপর উপুড়হয়ে পড়লো। মুখে অসংলগ্নভাবে যা বলতে লাগলো তা অনেকটা এই রকম—ওমা পোড়ানি—বড়-বৌ-হি হি কিকাণ্ড—হি—হি—বলে কিনা—ও বামুনদিদি—হি হি—আমি আরবাঁচবো না—ওমা—হি হি ইত্যাদি।

কামার-বৌ বললে—তা নাও, তুমি আবার যে এক কাণ্ডবাধালে ! গড়ে কপাল ঘেঁচে না যায় দেখো।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবস্থা দেখে অনঙ্গ-বৌ যে এত আশাবাদী, সে পর্যন্ত ভয় খেয়ে গেল। ধান চাল হঠাৎ যেন কর্পূরের মতো দেশ থেকে উবে গেল কোথায় ! এক দানা চালকোথাও পাওয়া যায় না। অত বড় গোবিন্দপুরের হাটে চাল আসে না আজকাল। খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোকফিরে যাচ্ছে চাল অভাবে।

হাহাকার পড়ে গিয়েচে হাটে হাটে।কুণ্ডুদের দোকানে যে এত চাল ছিল, বস্তা সাজানো থাকতোবালির বস্তার দেওয়ালের মতো, সে গুদাম আজকাল শূন্যগর্ভ। পথেঘাটে ক্রমশ ভিখিরির ভিড় বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, এরাএতদিন ছিল কোথায় সকলেই ভাবে, অথচ কেউ জানে না। এদেশের লোকও নয় এরা, বিদেশী ভিখিরি। একদিন অনঙ্গ-বৌরান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পাঁচ-ছটি অর্ধউলঙ্গ জীর্ণশীর্ণস্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা—ঘরেরদাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—ফ্যান খাইতাম—ফ্যানখাইতাম—

অনঙ্গ প্রথমটা ওদের উচ্চারণের বিকৃতির দরুন কথাটাকি বলা হচ্চে বুঝতে পারলে না। তা ছাড়া ‘খাইতাম’ এটাক্রিয়াপদের অতীত কালের রূপ এসব দেশে, তা বর্তমানেপ্রয়োগ করার সার্থকতা কি, এটা বুঝতেও একটু দেরি হল।

পরে বুঝলে যখন তখন বললে—একটু দাঁড়াও—ফ্যানদেবো।

ওরা হাঁড়ি তোবড়ানো টিনের কৌটো পেতে ফ্যাননিয়ে যখন চলে গেল, তখন অনঙ্গ-বৌ কতক্ষণ ওদের দিকেঅবাক হয়ে চেয়ে রইল। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে নাকি যেদেশ ছেড়ে এদের বিদেশে আসতে হয়েছে ছেলেমেয়ের হাতধরে এক মগ ফ্যান ভিক্ষে করতে ?অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জলএল। নিজের ছেলেরা পাঠশালায় গিয়েছে, ওদের কথা মনেপড়লো। এতগুলো লোককে ভাত দেওয়ার উপযুক্ত চাল নেইঘরে, নইলে দিত না হয় ওদের দুটো দুটো ভাত।

ক্রমে নানাস্থান থেকে ভীতিজনক সংবাদ আসতে লাগলো সব। অমুক গ্রামে চাল একদম পাওয়া যাচ্চে না, লোকে না খেয়ে আছে। অমুক গ্রামের অমুক লোক আজপাঁচদিন ভাত খায় নি ইত্যাদি। তবুও সবাই ভাবতে লাগলো, মানুষে কি সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে ?কখনই নয়। তাদেরনিজেদের কোনো বিপদ নেই।

একদিন অনঙ্গ-বৌ খুব ভোরে ঘাটে গিয়ে দেখলেজেলেপাড়ার রয়ে জেলের বৌ ঘাটের ধারের কচুর ডাঁটাতুলে এক বোঝা করেছে।

অনঙ্গ হেসে বললে—কি গা রয়ের বৌ, আজ বুঝি কচুরশাক খাবে ?

জেলে-বৌ যেন ধরা পড়ে একটু চমকে গেল। যেন সেআশা করে নি এত ভোরে কেউ নদীর ঘাটে আসবে। লুকিয়েলুকিয়ে এ কাজ করছিল সে, এমন একটা ভাব প্রকাশ পেলে ওর ধরনধারণে।

সে মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ, মা।

—তা এত ?এ যেন দু’তিন বেলার শাক হবে !

—সবাই খাবে মা, তাই।

বলেই কেমন এক অদ্ভুত ধরনে ওর মুখের দিকে চেয়েজেলে-বৌ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ অবাক হয়ে বললে—ওকি রয়ের-বৌ, কাঁদছিস কেন ?কি হল ?

রয়ের-বৌ আঁচলে চোখের জল মুছে আস্তে আস্তেবলে—কচ্চি কি সাধে মা ?এই ভরসা।

—কি ভরসা ?

—এই কচুর শাক মা। তিন দিন আজ কারো পেটেলক্ষ্মীর দানা সেঁধোয় নি।

—বলিস কি রয়ের-বৌ ?না খেয়ে

—নিনক্যি, মা নিনক্যে—তোমার কাছে মিছে কথাবলবো না সকালবেলা। কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরেএই যুজ্যের বাজারে?যুজ্যের আক্রা ভাত কার কাছে গিয়েচাইবো মা ?তাই বলি এখনো কেউ ওঠে নি, গাঙের ধারে ধারে বড় কচুর ডাটা হয়েছে, তুলে আনি গে। তাই কি তেলনুন আছে মা ?শুধু সেদ্ধ।

অন্নকষ্টের এ মূর্তিই কখনো দেখে নি অনঙ্গ। সেভাবলে—আহা, আমার ঘরে যদি চাল থাকতো ! আজরয়ের-বৌ আর তার ছেলেমেয়েকে কি না খাইয়ে থাকি ?

জেলে-বৌ আপনমনে বলতে লাগলো—এক সের দেড়সের মাছ ধরে। পয়সা বড় জোর দশ আনা বারো আনা হয়। এক কাঠা চাল কিনতি একটা টাকা যায়—তাও মিলছে না হাটেবাজারে। মোরা গরিব নোক, কি করে চালাই বলো মা—

অনঙ্গ-বৌ আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ি গেল।গঙ্গাচরণ ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে বসেছে, স্বামীকে বললে—হ্যাঁগা, এ কি রকম বাজার পড়লো চালের ?ভাতবিনে কি সব উপোস দিতে হবে ?আমাদের ঘরেও তো চাল বাড়ন্ত। আজকাল চালের ধান আর কেউ দেয় না। গাঁ থেকেধান গেল কোথায় ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—তামার পয়সা যেখানে গিয়েছে।অনঙ্গ-বৌ রেগে বললে—দ্যাখো ওসব রঙ্গরস ভালো লাগে না। একটা হিল্লে করো—ছেলেপুলে উপোস করেথাকবে শেষে ?

গঙ্গাচরণ চিন্তিত মুখে বললে—তাই ভাবছি। আমি কিচুপ করে বসে আছি গা ?কি হবে এ ভাবনা আমারও হয়েছে।

—চারিধারের ব্যাপার দেখে হাত-পা পেটের ভেতরঢুকে যাচ্চে যে। আর বসে থেকো না, উপায় দ্যাখো। তিন দিনের মতো চাল ঘরে আছে মজুত—

—আর ধান কতটা আছে ?

—সে ভানলে বড় জোর পাঁচ কাঠা চাল হবে। তাতেধরো আরো দশ দিন। তার পরে ?

—আমিও তাই ভাবছি।

—যা হয় উপায় করো।

দিন দুই পরে গঙ্গাচরণ পাঠশালা বন্ধ রেখে নরহরিপুরেরহাটে গেল চালের সন্ধানে। বিষ্টুপুর, ভাতছালা, সুবর্ণপুর, খড়িদীঘি প্রভৃতি গ্রাম থেকে ধানচাল জড়ো হয়ে আগেআগে নরহরিপুরের প্রসিদ্ধ চালের ও ধানের হাট বোঝাই হয়ে যেতো—সেই হাটের অত বড় চালাঘর খালি পড়েআছে—এক কোণে বসে শুধু এক বুড়ি সামান্য কিছু চালবিক্রি করছে।

গঙ্গাচরণ কাছে গিয়ে বললে—কি ধানের চাল?

—কেলে ধান ঠাকুর মশায়। নেবেন ?খুব ভালো চাল কেলে ধানের। কথায় বলে—

ধানের মধ্যি কেলে, মান্ষের মধ্যি ছেলে—

বুড়ির কবিত্বের দিকে তত মনোযোগ না দিয়ে গঙ্গাচরণ ওর ধামা থেকে চাল তুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।যেমন মোটা, তেমনি গুমো। মানুষের অখাদ্য। তবুও চালবটে, খেয়ে মানুষে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

—কতটা আছে ?

—সবটা নেবা তুমি ?তিন কাঠা আছে।

—দাম ?

—দেড় টাকা করে কাঠা।

গঙ্গাচরণ চমকে উঠলো, ভাবলে কথাটা সে শুনতে পায়নি। আবার জিজ্ঞেস করার পরেও যখন বুড়ি বললে এক কাঠার দাম দেড় টাকা, তখন গঙ্গাচরণের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। দেড় টাকায় আড়াই সের, তা হলে পড়লো চব্বিশ টাকা মণ !কি সর্বনাশ ! অনঙ্গ-বৌ এত দিন পরের বাড়ির ধান ভেনেচালিয়ে আসছিল বলে সে অনেকদিন হাটে-বাজারের চালেরদর জানে না। চাল এত চড়ে গিয়েছে তা তো জানা ছিল না।চারিদিক অন্ধকার দেখলো গঙ্গাচরণ। এত বড় নরহরিপুরেরহাট ধানচাল-শূন্য ?মানুষ এবার কি সত্যিই তবে না খেয়েমরবে ?কিসের কুলক্ষণ এসব ?পরশুও তো চালের দাম এতছিল না। দুদিনে যোল টাকা থেকে উঠলো চব্বিশ টাকাএক মণ চালের দর—তাও এই মোটা, গুমো, মানুষের অখাদ্যআউশ চালের ?

গঙ্গাচরণের সারা শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। কি করে সে চালাবে ?নিজেদের ধানের ক্ষেত নেই। চব্বিশ টাকা মণের চাল সে কিনে খাওয়াতে পারবে ক'দিন, বারোটাকা যার মাসিক আয় ?অনঙ্গ-বৌ না খেয়ে মরবে ?হাবুপটল না খেয়ে—না, আর সে ভাবতে পারে না।

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে দেখলে ধামাকাঠা হাতে আরো অনেকে হাটের দিকে ছুটেচে চালের চেষ্টায়।অনেকে ওকে জিজ্ঞেস করে, চাল কনে পালেন ও পণ্ডিত মশাই ?কি দর ?

চব্বিশ টাকা।

—মোটা আশ চাল চব্বিশঃ বলেন কি পণ্ডিতমশাই ?

—দেখ গে যাও হাটে গিয়ে।

বৃদ্ধ দীনু নন্দী একটা ধামা হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।দীনু নন্দী বাড়িতে বসে সোনা-রুপোর কাজ করে অর্থাৎ গহনাগড়ে। সোনার কাজ তত বেশি নয়, চাষা-মহলে গহনার কাজে সোনার চেয়ে রুপোর ব্যবহারই বেশি। কিন্তু এই দুর্দিনে গহনা কে গড়ায়, কাজেই দীনুর ব্যবসা অচল। দুটি বিধবা ভাই-বৌ, বৃদ্ধ মাতা ও কয়েকটি শিশুসন্তান, তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা তার ঘাড়ে। দীনু বললে—পণ্ডিত মশায়, চাল পাবো ?

ছুটে যাও। বড্ড ভিড়।

—ছুটি বা কোত্থেকে, পায়ে বাত হয়ে কষ্ট পাচ্চি বড্ড। দুবেলা খাওয়া হয় নি—

—বল কি ?

—সত্যি বলচি পণ্ডিত মশায়। বামুন দেবতা, এই অবেলায় কি মিছে কথা বলে নরকগামী হবো ?

দীনু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সজোরে প্রস্থান করলে।

গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরতে ফিরতেই কত লোক শুধু হাতেই হাট থেকে ফিরচে দেখা গেল। সাগরতলার কর্মকারদেরবাড়িতে একটু বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় দু'চারজনলোক সেখানে এসে জুটলো গল্প করতে।

একজন বললে—নরহরিপুরের হাটে চাল পাওয়া গেল না, আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন !

আর একজন বললে—লোকও জড়ো হয়েছে দেখুন গে।এক কাঠা চাল নেই। কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন না খেয়েআছে। আমারই বাড়িতে দুদিন ভাত খায় নি কেউ।

গঙ্গাচরণ বললে—আটা ময়দা নিয়ে যে খাবে, তাওনেই।

—বস্তাপচা আটা আছে দু-এক দোকানে, বারো আনাসের ! কে খাবে ?

আরো মাইলখানেক এগিয়ে গেল গঙ্গাচরণ। খল্‌সেখালিরসনাতন ঘোষ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চে, ওকেদেখে বললে—পণ্ডিত মশাই, ওতে কি?চাল নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলেন ?

—সে যা কষ্ট তা আর বোলো না। এক বুড়ির কাছথেকে সামান্য কিছু আদায় করেছি, তাও আগুন দর।

—কই দেখি দেখি ?

সনাতন ঘোষ নেমে এসে ওর হাতের পুঁটুলিটা নিজেরহাতে নিয়ে পুঁটুলি নিজেই খুলে চাল দেখতে লাগলো। ওর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। চালের দানা পরীক্ষা করতে করতে বললে—বড্ড মোটা। কত দর নিলে ?একটা কথা বলবো পণ্ডিত মশাই ?

—কি ?

—দাম আমি যা হয় দিচ্চি। আমায় অর্ধেকটা চাল দিয়েযান। দিতেই হবে। দু'দিন না খেয়ে আছে সবাই। মেয়েকেশ্বশুরবাড়ির থেকে এনে এখন মহা মুশকিল, সে বেচারিরপেটে আজ দু'দিন লক্ষ্মীর দানা যায় নি—কত চেষ্টা করেওচাল পাই নি—

সনাতন ঘোষের অবস্থা খারাপ নয়, বাড়িতে অনেকগুলোগরু, দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে নরহরিপুরের ময়রাদের দোকানে যোগান দেয়—এই তার ব্যবসা। গঙ্গাচরণ ইতিপূর্বে সনাতনেরবাড়ি থেকে থেকে দু'এক খুলি টাটকা ছানা নিয়েও গিয়েছে। তার আজ এই দশা ! কিন্তু চাল মাত্র সে নিয়েছে তিন কাঠা। আর কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। এ চাল দিলে তারস্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকবে দুদিন পরে। চাল দেওয়ার ইচ্ছেতার মোটেই নেই—এদিকে সনাতন মোক্ষম ধরেচে চালের পুঁটুলি, তার হাত থেকে চাল নিতান্তই ছিনিয়ে নিতে হয় তাহলে। কিংবা ঝগড়া করতে হয়।

সনাতন ততক্ষণে কাকে ডেকে বললে—ওরে একটাধামা নিয়ে আয় তো বাড়ির মধ্যে থেকে ?একটা কাঠাওনিয়ে আয়—

সনাতন নিজের হাতে এক কাঠা চাল যখন মেপেঢেলে নিয়েছে, তখন গঙ্গাচরণ মিনতিসূচক ভদ্রতার সুরেবললে—আর না সনাতন, আর নিয়ো না—

—আর আধ কাঠা—

—না বাপু, আমি আর দিতে পারবো না। বাড়িতে চালবাড়ন্ত—বুঝলে না ?

সনাতনের নাতিটি বললে—দাদামশাই, ওঁর চাল আরনিয়ো না, দিয়ে দাও।

সনাতন মুখ খিচিয়ে বলে উঠলো—তোদের জন্যি বাপু খেটে মরি, নিজের জন্যি কিসের ভাবনা ! একটা পেট যে করেহোক চলে যাবেই। রইল পড়ে চাল, যা বুঝিস করগে যা।

রাগ না লক্ষ্মী। গঙ্গাচরণ বিনা চক্ষুলজ্জায় সমস্ত চালউঠিয়ে নিয়ে চলে এল। বাড়ি এসে দেখলে অনঙ্গ-বৌ ভাত চড়িয়ে ওল কুটতে বসেচে রান্নাঘরের দাওয়ায়। স্বামীকে দেখে বললে—ওগো শোনো,আমি এক কাজ করিচি। সেদিন সেইবোষ্টম প্রভাতী সুরে গান করছিল, মনে আছে ?আজ এসেছিল, কি সুন্দর গান যে গায় !

—কে বল তো ?

—সেই যে বলে—'উঠ গো উঠ নন্দরানি কত নিদ্রা যাও গো'—বেশ গলা-লম্বা মততা, ফর্সা মতো বোষ্টমটি—

ওর বাড়ি বেনাপোল। বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের পীঠ আছে, সেখানকার কাজকর্ম করতো। বেশ গায়।

—আমি তাকে বললাম রোজ সকালে এসে আমাদেরবাড়িতে ভগবানের নাম করবে। ভোরবেলায় বড় ভালো লাগেভগবানের নাম। মাসে একটা টাকা আর এক কাঠা চালেরএকটা সিধে দিতে হবে বলেছে, এই ধরো ডাল, নুন, বড়ি, দুটো আলু, বেগুন, একটু তেল—এই। আমি বলিচি দেবো।কাল থেকে গাইতে আসবে। হ্যাঁগা, রাগ করলে না তো শুনে ?

—তোমার যে পাগলামি। বলে, নিজে খেতে জায়গাপায় না, শঙ্করাকে ডাকে। দেবে কোথা থেকে ?

—তুমি ঝগড়া কোরো না। সকালে উঠে ভগবানের নামশুনবে যে রোজ রোজ তখন ?হুঁ হুঁ—আমি যেখান থেকে পারি জুটিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না কিছু। গরিব বলে কি ভালো গান শুনতে নেই ?

পরদিন খুব ভোরে সেই বোষ্টমটি সুস্বরে প্রভাতী গানগাইতে গাইতে ওদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ খুশিতে ভরপুর হয়ে পাশের ঘরে এসে স্বামীকে ডেকেবললে—ওগো শুনচো ?কেমন গায় ?আর ভগবানেরনাম—বেশ লাগে—না ?

গঙ্গাচরণ কিছু জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে পাশ ফিরেশুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—আহা, ঢং দ্যাখো না !ওগো গান শোনোতাতে জাত যাবে না।

—আমি কি রাজা যে বন্দীরা প্রভাতী গান গেয়ে আমারঘুম ভাঙাবে ?তোমার পয়সা থাকে তুমি বন্দীদের মাইনে দিয়ো গো রানী, আমি ওর মধ্যে নেই।

—আমার বন্দীর গান যে শুনবে, তাকে পয়সা দিতেহবেই। তবে কানে আঙুল দাও।

গঙ্গাচরণ হেসে কান চেপে ধরে বললে—এই দিলাম।

একটু বেলা হলে অনঙ্গ-বৌ রান্না চড়ালে, তার পরে মনে মনে হিসেব করে দেখলে দিন দশ-বারো পরে চাল একেবারেফুরিয়ে যাবে, তখন উপায় কি হবে ?চাল নাকি হাটে পাওয়াযাচ্চে না। সবাই বলছে। তার স্বামী নির্বিরোধী মানুষ, কোথা থেকে কি যোগাড় করবে এই দুর্দিনে ?ভাবলে মায়া হয়।

কাপালীদের ছোট-বৌ চুপি চুপি এসে বললে— বামুন-দিদি, একটা কথা বলবো ?এক খুঁচি চাল ধার দিতি পারো ?

—মুশকিল করলি ছোট-বৌ। তোদের চাল কি বাড়ন্ত?

—মোটে নেই। কাল ছোলা সেদ্ধ খেয়ে সব আছে। নাহয় ছোট ছেলেটিকে দুটি ভাত দিয়ো এখন দিদি। আমরা যাহয় করবো এখন।

অনঙ্গ-বৌ কি ভেবে বললে—একটু দাঁড়া। এসেচিসযখন তখন নিয়ে যা এক খুঁচি চাল। ওতে আমাদের কতদিনেরসাশ্রয় বা হোত ?

কাপালী-বৌ চাল আঁচল পেতে নিয়ে বললে—একজায়গায় কচুর শাক আছে, তুলতে যাবে বামুন-দিদি ?গেরামে তো কচুর শাক নেই—যে যেখান থেকে পারচে তুলে নিয়েযাচ্চে। গাঙের ধারে এক জায়গায় সন্ধান করিচি, ঢের কচুর শাক হয়ে আছে। দু'জনে চলো চুপি চুপি তুলে আনি।

—চল্, আজ দুপুরে যাবো। চাল তো নেই। যা দেখছিওই খেয়েই থাকতে হবে দুদিন পরে।

কাপালী-বৌ হেসে বুড়ো আঙুল তুলে নাচিয়েবললে—লবডঙ্কা ! তাই বা কোথায় পাচ্ছ বামুন দিদি ?কাওরাপাড়ার মাগী-মিন্সে এসে গাঙের ধারের যত শুষনি শাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক তুলে উজোড় করে নিয়ে যাচ্ছে দিনরাত। গিয়ে দ্যাখো যে কোথাও নেই। আমি কি খোঁজ করি নি বামুনদিদি ?ওই খেয়ে আজ দুদিন বেঁচে আছি—ওইসব শাক আর ছোলা সেদ্ধ। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেবড়াই করে কি করবো ?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ি মিটিং বসেছে।

বর্তমানসমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যেই মিটিং, তবেকাপালী-পাড়ার লোক ছাড়া অন্য কোনো লোক এতে উপস্থিতনেই। ক্ষেত্র কাপালী বললে—এখন ধান আমাদের দেবেনকিনা বলুন বিশ্বেস মশায় !

বিশ্বাস মশায় অনেকক্ষণ থেকে সেই একই কথা বলছেন—ধান নেই, তার দেবো কি ! আমার গোলা খুঁজেদ্যাখো!

অধর কাপালী বললে—আমাদের পাড়াটা আপনি কর্জদিয়ে বেঁচিয়ে রাখুন। আসচে বারে আপনার ধার এক দানাওবাকি রাখবো না।

বিশ্বাস মশায়ের বাঁ-দিকে গঙ্গাচরণ অনেকক্ষণ থেকেবসে আছে। সে এসেছিল ধানচাল সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা বিশ্বাস মশায়ের সাহায্যে, সেই চেষ্টায়। এত বড়মিটিং-এর মধ্যে এসে পড়বে তা সে ভাবে নি ?সে চুপ করেবসেই আছে।

হঠাৎ তার দিকে ফিরেই বিশ্বাস মশায় বললেন—পণ্ডিতমশাই, আপনি এই নিন গোলার চাবি। এদের গিয়ে খুলেদেখান ওতে কি আছে—

বিশ্বাস মশায় চাবিটা গঙ্গাচরণের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই ক্ষেত্র কাপালী বলে উঠলো—গোলা দেখতি হবে না। আমরা জানি ও গোলাতে আপনার ধান নেই !

চটে উঠে বিশ্বাস মশায় বললেন—তবে কোথায় আছে ?

—আপনি ধান লুকিয়ে রেখেছেন বাড়িতে।

—তুমি দেখেচ ? —দেখতে হবে না, আমরা জানি।

কথা শেষ করে ক্ষেত্র কাপালী মিটিং ছেড়ে উঠে চলেগেল।

অধর কাপালী অনুনয়ের সুরে বললে—শুনুন বিশ্বেসমশায়, আপনি পাড়ার মা-বাপ। এ বিপদে যদি আপনি নাবাঁচান, তবে ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াই বলুন দিকি ?অমন করবেন না। ধানের ব্যবস্থা আজ করে দিতেই হবেআপনাকে।

বিশ্বাস মশায় দাঁত খিচিয়ে বললেন—অমনি বলে সবাই। তুমি তো আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি হলে—তারপর ঠ্যালা সামলায় কে শুনি ?ধান আমার নেই।

—একটু দয়া করুন—এটু আমাদের দিকি চান। আজ দুদিন বাড়িতে একটা চালের দানা কারো পেটে যাই নি, সত্যি বলছি।

—বেশ, তুমি আধ কাঠা চাল ঘর থেকে নিয়ে যাও না, তাতে কি ?না হয় আমি এক মুঠো কম খাবো। সে কথাতো বললিই হয়, কি বলেন ঠাকুর মশাই ?

গঙ্গাচরণ চুপ করে রইল, এ কথায় সায় দিলে পাড়ারলোকে তার ওপর চটে যাবে, সবাইকে নিয়ে বাস করতেহবে যখন, কাউকে সে চটাতে চায় না।

সভা বেশিক্ষণ চললো না। বিশ্বাস মশায়ের কাছে যারাদরবার করতে এসেছিল, সবাই বুঝলে এখানে ডাল গলানো শক্ত। যে যার বাড়ি চলে গেল।

গঙ্গাচরণ সুযোগ পেয়ে বললে—বিশ্বাস মশায়, আমিকি না খেয়ে মরবো ?

—কেন ?

—বাজারে চাল অমিল। আর দুদিন পরে উপোস শুরুহবে। কি করি পরামর্শ দিন।

—আমার বাড়ি থেকে দুকাঠা চাল নিয়ে যাবেন।

—তা দিয়ে ক'দিন চলবে বলুন !

—কেন ?

—আমার বাড়ির পুষ্যি দু'তিনজন ! ও দু'কাঠা চাল নিয়ে কদিন খাবো ?আমার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না করলে এইবিপদের দিনে আমি কোথায় যাই ?পাঠশালা চালাই কি খেয়ে ?

—আমার ধানচাল থাকতো তো বলতে পারা যেতো, কিন্তু আমার তা নেই। আজ দু'কাঠা চাল নিয়ে যান, দিচ্চি— গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে চলে গেল।

সে রাত্রে বিশ্বাস মশায় আহারাদির পর পুকুরপাড় থেকে গরু আনতে গিয়েছেন, কারণ সেখানেই তাঁরগোয়াল—এমন সময় দুজন লোককে গাছের আড়ালে দেখেবলে উঠলেন—ওখানে কে ?

—তোর বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে বিশ্বাস মশায়ের মাথায় সজোরেএক লাঠি বসিয়ে দিলে। এর পর ওরা তাঁকে পুকুরপাড়েরবাবলা গাছের সঙ্গে মোটা দড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে। বিশ্বাসমশায়ের জ্ঞান রইল না বেশিক্ষণ মাথার যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে।

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই দেখলেন সূর্যের আলো জানলা দিয়েএসে পড়েছে, তার বিধবা বড় মেয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকেপড়ে কাঁদচে।

বিশ্বাস মশায় বলে উঠলেন—ডাকাত ! ডাকাত !

বড় মেয়ে সৌদামিনী বললে—ভয় কি বাবা ?আমি—আমি যে—এই দ্যাখো।

বিশ্বাস মশায় ফ্যালফ্যাল্ চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন।

সৌদামিনী বললে—বাবা কেমন আছ ?

বিশ্বাস মশায় একবার ডাইনে বাঁয়ে সতর্কতার সঙ্গে চেয়ে দেখে চুপিচুপি বললেন—সব নিয়ে গিয়েছে ?

—কি বাবা ?

—সেই সব।

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। সব ঠিক আছে।

—সেই যা আড়ায় তোলা আছে ?বস্তা ?

—কিছু নেয় নি।

—আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখা মা—

সৌদামিনী বাপের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললে— তুমি সেরে সেমলে ওঠো, আমি কি মিথ্যে বলছি তোমারে ?আড়ার ওপর যে বস্তা রেখিলে তা কেউ নেয় নি।

—তক্তাপোশের তলায় যে বস্তা ছিল ?

—সব ঠিক আছে। নেবে কে ?

এই সময় গঙ্গাচরণ ঘরে ঢোকাতে ওদের কথা বন্ধ হয়েগেল।

গঙ্গাচরণ পাশে বসে বললে—কেমন আছেন বিশ্বাসমশায় ?

—আছি এক রকম।

গঙ্গাচরণ মুরুব্বিয়ানাভাবে বললে—হাতটা দেখি—

পরে বিজ্ঞের মতো মুখ করে বিশ্বাস মশায়ের নাড়ীপরীক্ষা করে বললে—হুঁ!

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন সুরে বললে—কি রকম দেখলেনপণ্ডিত মশাই ?

—ভালো। তবে কফের ধাত একটু প্রবল হয়েছে।সৌদামিনী উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করলে—তাতে কি হয় ?

—হবে আর কি, তবে বয়েস হয়েছে কিনা, কফেরআধিক্য—

—ভালো করে বলুন।

—মানে জিনিসটা ভালো না।

বিশ্বাস মশায় স্বয়ং এবার মিনতির সুরে বললেন— আমাকে এবারটা চাঙ্গা করে তুলুন পণ্ডিতমশাই। আপনি দশসের চাল নিয়ে যাবেন।

—থাক থাক, তার জন্যে কি হয়েছে ?

সৌদামিনী কিন্তু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলো—না, আজই নিয়ে যাবেন'খন। ধামা আমি দেবো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন নয়। সন্দের পরে। কেউটের না পায়।

গঙ্গাচরণ এ অঞ্চলে কবিরাজিও করে। কিন্তু কবিরাজিএখানে ভালো চলে না— কারণ এখানকার সবার 'সারকুমারীমত'। সে এক অদ্ভুত চিকিৎসার প্রণালী। জ্বর যত বেশিইহোক, তাতে স্নানাহারের কোনো বাধা নেই। দু'চারজন সেরেওওঠে, বেশির ভাগই মরে। তবুও-মতের লোক কখনো ডাক্তারবা কবিরাজ দেখাবে না, মরে গেলেও না।

গঙ্গাচরণ কথাটা জানে, তাই বললে—আপনার সেই সারকুমারী মতের ফকির আসবে নাকি ?

-নাঃ, সেবার জলজ্যান্ত নাতিটাকে মেরে ফেললে— আমি ও-মতে আর নেই।

—ঠিক তো ?দেখুন, তবে আমি চিকিচ্ছে করি মন দিয়ে।সৌদামিনী বলে উঠলো—আপনি দেখুন ভালো করে।আমি ও-মতের আর কাউকে যেতে দেবো না বাড়িতে। চালনিয়ে যাবেন সন্দের পরে।

দিন দুই পরে বিশ্বাস মশায় একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন।একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে বিশ্বাস মশায় বিছানায় উঠেবসে তামাক খাচ্চেন। গঙ্গাচরণ শুনলে, এ গ্রাম থেকে বিশ্বাসমশায় উঠে যাচ্চেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্চে। বাইরে আট-দশখানা গরুর গাড়ির চাকার দাগ। রাত্রে এই গাড়িগুলো যাতায়াত করেছে বলেই মনে হয়। গঙ্গাচরণ বুঝতে পারলে, বিশ্বাস মশায় মজুদ ধান চাল সব সরিয়ে দিয়েচেন রাতারাতি।

গঙ্গাচরণ বললে—কোথায় যাবেন চলে নিজের গাঁছেড়ে?

বিশ্বাস মশায় বললেন—আপাতোক যাচ্চি গঙ্গানন্দপুর, আমার শ্বশুরবাড়ি। এ গাঁয়ে আর থাকবো না। এ ডাকাতের দেশ। সামান্য দু'চার মণ ধান চাল কে না ঘরে রাখে বলুনতো পণ্ডিত মশায়। তার জন্যে মানুষ খুন ?আজ ফস্‌কেগিয়েচে, কাল যে খুন করবে না তার ঠিক কি?না, এ দেশেরখুরে নমস্কার বাবা।

—আপনার জমিজমা পুকুর এ সবের কি ব্যবস্থা হবে?

—আমার ভাগ্নে দুর্গাপদ মাঝে মাঝে আসবে যাবে।সে দেখাশুনো করবে। আমি আর এমুখো হচ্চি নে কখনো।

ঢের হয়েছে। ভালো কথা, একটা ভালো দিন দেখে দেবেন।তো যাবার ?

বুধবার সকালবেলা বিশ্বাস মশায় সত্যসত্যই জিনিসপত্রসমেত নতুন গাঁ কাপালী-পাড়ার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন।

অনঙ্গ-বৌ শুনে বললে—এই বিপদের দিনে তবুও এইএকটা ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায়, ওখানে তবুপাওয়া যেতো। এবার গাঁয়ের খুব দুর্দশা হবে। একদানা ধানচালকারো ঘরে রইল না আর। ভয়ে পড়েই লোকটা চলে গেল।

শ্রাবণ মাসের শেষ।

বেড়ায় বেড়ায় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছে। কোঁচ বকেরলম্বা সারি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় এপার থেকে ওপারেরদিকে।

অনঙ্গ-বৌ নদীর ঘাটে জল তুলতে গিয়েচে। ভূষণঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কাদার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি করচে। অনঙ্গ-বৌকে দেখে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যেন এ অবস্থায় কারো সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভালোছিল, ভাবটা এমন।

অনঙ্গ-বৌ কৌতুহলের সঙ্গে বললে—কি হচ্ছে গোগয়লা-দিদি ?

ভূষণ ঘোষের বৌয়ের বয়স বেশি নয়, অনঙ্গ-বৌয়েরসমবয়সী কিংবা দু-এক বছরের বড় হতেও পারে। আঁচলে কি একটা ঢেকে সলজ্জভাবে বললে—কিছু না ভাই—

—কিছু না, তবে ওখানে কি হচ্ছে, তোমার মরণ ?

—এমনি।

—তবুও ?

—সুষনি শাক তুলচি—

বলেই হঠাৎ সলজ্জ হাসি হেসে আঁচল দেখিয়েবললে—মিথ্যে কথা বলবো না বামুনের মেয়ের সামনে।এই দ্যাখো—

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—ও কি হবে ?হাঁসআছে বুঝি ?

গয়লা-বৌয়ের আঁচলে একরাশ কাদামাখা গেঁড়ি-গুগলি।সে বললে—হাঁস নয় ভাই, আমরাই খাবো।

—ও কি করে খায় ?

—এমনি। শাঁস বের করে ঝাল-চচ্চড়ি হবে।

—সত্যি?

—অনেকে খায়, তুমি জানো না ?আমরা শখ করে খাইভাই।

—কি করে রাঁধে আমাকে বলে দিয়ো তো ?

—না ভাই, তুমি খেতে যাবে কি দুঃখে ?তোমাকে বলেদেবো না।

সেদিনই একটু বেলা হলে কাপালীদের ছোট-বৌ এসে বললে—এক খুঁচি চাল ধার দিতি পারো দিদি ?বড় লজ্জায় পড়িচি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি ভাই ?

—ভূষণ কাকার বৌ এসেছে দুটো চাল নিতি। দুদিন ভাত পেটে যায় নি। দুটো গেঁড়ি-গুগলি তুলে এনেচে সেদ্দ করে খাবে। কিন্তু দুটো চাল নেই—আমার বাড়ি এসেচে —তাবলে, তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে

—আমারও চাল নেই ভাই।

—দুটো একটা হবে না ?

—আছে, দেবার মতো নেই। তোর কাছে নুকুবো না, সের চারেক চাল আছে, তা থেকে দেবো না। তিন বেলারখোরাকও নেই।

কাপালী-বৌ বসে পড়ে গালে হাত দিয়ে টেনে টেনেবললে—তাই তো, কি হবে উপায় দিদি ?চাল তো কোথাও নেই, কি করি বল তো ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ছিল বিশ্বাস মশায়, তার ঘরে যা হয় দুটো ধান চাল ছিল। সেও চলে গেল—

—আমরাও তো তাই বলি—

তবে কোন্ সাহসে চাল দেবো বের করে ?

—তা তো সত্যি কথাই।

হঠাৎ অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—রাগ করলি ভাইছোট-বৌ ?

—না ভাই, এর মধ্যে রাগ কিসের ?

—আঁচল পাত। চাল নিয়ে যা—

—তোমাদের ?

—যা হয় হবে। তবু থাকতে দেবো না তা কি হয় ?নিয়ে যা—

দিনকতক পরে চালের ঘোর অনটন লোকের ঘরে ঘরে।প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি এসে চাল ধার চায়, কে কাকে দেবে ?অনঙ্গ-বৌ দুদিন ছেলেদের মুখে ভাত দিতে পারলে না, শুধুসজনে শাক সেদ্ধ। একদিন এসে

কাপালী-বৌ দুটো সুষনি শাক দিয়ে গেল, একদিন গঙ্গাচরণ কোথা থেকে একখানাথোড় নিয়ে এল। ভাতের ফ্যান চেয়ে ঘরে ঘরে ফিরচে ত্রিপুরা জেলা থেকে আগত মেয়ে-পুরুষ। গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে রামলাল কাপালী এসে গঙ্গাচরণকে চুপিচুপি বললে—পণ্ডিতমশায়, চাল নেবেন ?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায় ?

—মেটেরা বাজিতপুর থেকে আমার শ্বশুর এক বস্তা চাল নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন আমার বাড়ি। দেড় মণ চাল, বেনামুড়ি ধানের ভালো চাল। ছোট-বৌ বললে—বামুনদিদির বাড়ি বলে এসো।

—কি দর ?

—শ্বশুর বলচে চল্লিশ টাকা করে মণ—

—আউশ চালের মণ চল্লিশ টাকা ? —তাই মিলছে না দাদাঠাকুর। আপনি তো সব জানো।

গঙ্গাচরণ ইতস্তত করতে লাগলো। দু'গাছা পাতলা রুলিআছে অনঙ্গ-বৌয়ের হাতে। একবার গেলে আর হবে না।

কিন্তু উপায় কি ?ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেতো ?বাড়িতে এসে স্ত্রীর কাছে বলতেই তখুনি সে খুলেদিলে। এক মণ চালই এসে ঘরে উঠলো।

রামলাল কাপালী বলে দিলে—চুপি চুপি নিয়ে যাবেনদাদাঠাকুর।

সন্ধ্যার অনেক পরে চাল নিয়ে আসতে গিয়ে গঙ্গাচরণ ও তার দুই ছেলে পড়ে গেল নিমাই জেলের সামনে। সেনদীতে যাচ্চে আলোয় মাছ ধরতে। ওদের দেখে বলল—কে ?

গঙ্গাচরণ বললে—এই আমরা।

—কে পণ্ডিত মশাই ?পেন্নাম হই। কি ওতে ?

—ও আছে।

—ধান বুঝি পণ্ডিত মশাই ?

—হাঁ।

নিমাই জেলের বিধবা মেয়ে পরদিন ভোর না হতে এসে হাজির। না খেয়ে মারা যাচ্ছে ওরা, দুটো ধান দিতে হবে। অনঙ্গ-বৌমিথ্যে কথা বলতে তেমন পারে না, না ভেবেই বলেবসলো—ধান তো নেই ঘরে, চাল এনেছিলেন কিনে উনি।

—তাই দুটো দ্যান বামুন-দিদি, না খেয়ে মরচি। দিতে হল। ঘরে থাকলে না দিয়ে পারা যায় না। ফলে দলে দলে এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে লোক আসতেলাগলো—কেউ ভাত চায়, কেউ চাল চায় দুটি। এক মণচাল দশ দিনে উঠে গেল, মাঝে পড়ে অনঙ্গ-বৌয়ের শেষ সম্বল রুলি দু'গাছা অনন্তের পথে যাত্রা করলো।

ইতিমধ্যে একদিন ভাতছালা থেকে মতি মুচিনী এসেহাজির।

অনঙ্গ-বৌ বললে-কি রে মতি ?আয় আয়—

মতি গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে বললে—গড় করি দিদি-ঠাকরুণ।

—কি রকম আছিস ?এ রকম বিচ্ছিরি রোগা কেন ?

—ভালো না দিদি-ঠাকরুণ। না খেয়ে এমনি দশা।

—তোদের ওখানেও মন্বন্তর ?

—বলেন কি দিদি-ঠাকরুণ, অত বড় মুচিপাড়ার মধ্যেলোক নেই। সব পালিয়েছে।

—কোথায় ?

—যে দিকি দু'চোক যায়। দিদি-ঠাকরুণ, সাতদিন ভাতখাই নি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি-গুগলি। তাও এদানিমেলে না। ভাতছালার সেই বিলির জল ঘোল-দই। শুধু দ্যাখোমুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। আর আধ পোয়া মাছও হয় না। ছোট ছোটছেলেমেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে, ওদের মা কাঁচা পেঁড়ি-গুগলিতুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে এসে আবার জলেনেমেছে। কত মরে গেল ওই সব খেয়ে। নেতু বুনোর ছোটমেয়েটা তো ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে।

—বলিস কি মতি ?

—আর বলবো কি। অত বড় মুচিপাড়া ভেঙে গিয়েচেদিদি-ঠাকরুণ।

—কেন ?

—কে কোথায় চলে গেল ! না খেয়ে কদিন থাকা যায়, বলুন ?যার চোক যেদিকে যায় বেরিয়ে পড়েছে। আমার ভাইদুটো, অমন জোয়ান ভাইপো দুটো না খেয়ে খেয়ে এমনিখ্যাংরাকাটি—তারপর কোন্ দিকি যে তারা চলে গেল তাজানি নে। আহা, অমন জোয়ান দুই ভাইপো। আর এই দ্যাখো আমার শরীল—

হাত দুটো বের করে দেখিয়ে মতি মুচিনী হাউ-হাউকরে কেঁদে উঠলো।

অনঙ্গ-বৌ তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললে—কাঁদিসনে মতি। জল খা, একটু গুড় দি। ভাত দেবো। ক'দিন খাস নি ?

মতি দু'হাতের আঙুল ফাঁক করে বললে-সাতদিন।

শেষ পর্যন্ত মতি মুচিনীর অবস্থা অনঙ্গ-বৌয়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলে।

না খেয়েও তাহলে মানুষ কষ্ট পায়, নয় তো ভাতছালারঅতগুলো মুচির অবস্থা আজ এরকম হল কি করে ?

এই অসময়ে আবার একদিন এসে পড়লো কামদেবপুরেরদুর্গা পণ্ডিত।

সেদিন অনঙ্গ-বৌ দুটো সুষনি শাক তুলে এনেচে নোনাতলার জোল থেকে, সে যেন এক পরম প্রাপ্তি। খুব বেলাগেলে কাপালীদের ছোট-বৌ সেদিন ডাকলে—ও বামুন-দিদি, চলো এক জায়গায়—

—কোথায় রে ছুটকি ?

—নোনাতলার জোলে—

—কেন রে, এত বেলা গেলে নোনাতলার জোলে ?তোর নাগর বুঝি লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করবে ?

—আ মরণ বামুন-দিদির ! সোয়ামী আছে না আমার ?অমন বুঝি বলতি আছে সোয়ামী যাদের আছে তাদের?তোমরা রূপসী-বৌ, তোমাদের নাগর থাকুক, আমার দিকিকে তাকাবে তোমরা থাকতি ?তা না গো—সুষনি শাক হয়েচে অনেক, নুকিয়ে তুলে আনি চলো। কেউ এখনো টের পায়নি—টের পেলে আর থাকবে না।

নোনাতলার জোল গ্রামের পেছনদিকের বাঁশবনআমতলার পেছনে ঘন ঝোপে ঘেরা জায়গা। বর্ষাকালে নিচু জায়গাতে জল বাধে—এখন জল নেই—শরতের শেষে জলাশয় শুকিয়ে উঠছে। ভিজে মাটির ওপর নতুন সুষনি শাকএকরাশ গজিয়েচে দেখে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে হাসি ধরে না।বললে—এ যে ভাই অনেক !

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—একেই বলেকাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো !

—তা হোক, কারো চুরি তো করচি নে।

—ভগমানের জিনিস হয়ে আছে, তুলে খাও। এখনো কেউ টের পাই নি তাই রক্ষে ! নইলে ভেসে যেতো সবএতদিন।

অনঙ্গ-বৌ আবার ভীতু মেয়ে, একটা শেয়াল ঝোপেরদিকে খসখস করতেই চমকে উঠে বলে উঠলো—কি রে কাপালী-বৌ, বাঘ না তো ?

—বাঘ না তোমার মুণ্ডু বামুন-দিদি ! দ্যাখো না চেয়ে—

—তুই কি করে এ বনলা জায়গায় শাকের সন্ধান পেলি ?সত্যি কথা বল ছুটকি—

অনঙ্গ-বৌ কাপালীদের ছোট-বউয়ের স্বভাবচরিত্রেরকথা কিছু কিছু না জানতো এমন নয়। গোড়া থেকেই ওরমনে সন্দেহ না হয়েছিল এমন নয়।

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—দূর—

—আবার ঢাকছিস ?এখানে তুই কি করে এলি রে?কখন এলি ?এখানে মানুষ আসে ?

—এ্যালাম।

—কেন এলি ?

কাপালী-বৌয়ের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলো। বললে— এমনি।

—মিথ্যে কথা। এমনি নয়। বলি হ্যাঁরে ছুটকি, তোর ওস্বভাব গেল না ?ভারি খারাপ ওসব, জানিস ?স্বামীকে ঠকিয়েওসব এখনো করতে তোর মন সরে ?ছিঃ

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল। অন্য কেউ এমন কথাবললে সে রেগে ঝগড়াঝাটি করতো, কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়েরমধ্যে এমন কিছু আছে যাতে কারো সাধ্য হয় না তার মুখের ওপর কথা কইতে। বিশেষ করে যখন সে একটা এমন ধরনেরব্যাপারের প্রতিবাদ করচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—না সত্যি ছুটকি, তুই রাগ করিসনে। আমি ঠিক কথা তোরে বলচি—

কাপালী-বৌ কাঁকি মেরে মুখ ওপরের দিকে ফুটন্তফুলের মতো তুলে বললে—আমি কি আসতে চাই ?আমাকেছাড়ে না যে—

—কে ?

—নাম নাই বললাম বউ-দিদি ?

—বেশ যাক্ সে। না ছাড়লেই তুই অমনি আসবি ?

—আমারে চাল যোগাড় করে এনে দেয়। সত্যি, বউ-দিদিতুমি সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানি—মিথ্যে বলবো না তোমার কাছে, বামুন দেবতা। সেদিন আমি না খেয়ে উপোস করে আর পারি নে। খিদে সহ্যি করতে পারি নে ছেলেবেলা থেকি। বাপ মাথাকতি, সকাল সকাল এক পাথর পান্তাভাত দুটো কাঁচা পেঁয়াজদিয়ে বেড়ে দিত, খেতাম পেট ভরে।

—তারপর বল্—

—সেদিন উপোস করে আছি সারাদিন, ও এসে বললে—

এই পর্যন্ত বলে কাপালী-বৌ লজ্জায় মুখ নিচু করেবললে—না, সে কথা আর—

—কি বললে ?

—চাল দেবো আধ কাঠা।

—তাইতে তুই—

এই পর্যন্ত বলেই অনঙ্গ-বৌ চুপ করে গেল। ওর কাছেএসে ওর হাত ধরে গম্ভীর সুরে বললে—ছুট্‌কি ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

—তুই আমার কাছে গেলি নে কেন ?

—তুমি সেদিনও আমার সঙ্গে শাক তুলে নিয়ে গেছলে।তোমার কাছে কিছু ছিল না সেদিন।

—যেদিন মতি মুচিনী এল ভাতছালা থেকে ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ ছলছল করে এল। সে আর কিছুবলে কাপালী-বৌয়ের ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

দুর্গা পণ্ডিত এসে আড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল ওদেরদাওয়ায়। বাড়িতে কেউ ছিল না, গঙ্গাচরণ পাঠশালায়, ছেলেরা কোথায় বেরিয়েছিল। অনঙ্গ-বৌ শাক তুলে বাড়িফিরে এসে দেখে প্রমাদ গনলো। আজই দিন বুঝে ! শুধু এইশাক ভরসা, দুটো কটা মোটা নাগরা চাল কোথা থেকে উনিওবেলা এনেছিলেন, তাতে একজনেরও পেট ভরবে না।

দুর্গা পণ্ডিত বললেন—এসো মা। তোমার বাড়ি এলাম।

—বসুন, বসুন।

—তোমাদের সব ভালো ?

—এক রকম ওই।

আধঘণ্টা পরে দুর্গা পণ্ডিত হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়েঅনঙ্গ-বৌয়ের কাছে তার দুঃখের বিবরণ দিতে বসলে। যেন অনঙ্গ-বৌ তার বহুদিনের আপনার জন।

অনঙ্গ বললে—তিন দিন খান নি ?বলেন কি ?

—আমিই তো নয়, বাড়িসুদ্ধ কেউ নয় মা। বলি নাখাওয়ার কষ্ট আর সহ্যি হয় না, আমার মায়ের কাছে যাই।

—তা এলেন ভালোই করেছেন।

অনঙ্গ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো, আপাতোকবুড়োকে কি দিয়ে একটু জল দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পুরোনো দুটো চা পড়ে আছে হাঁড়ির মধ্যে পুঁটুলিতে। বললে—একটু চা করে দেবো ?

দুর্গা পণ্ডিত খুশির সঙ্গে বলে উঠলো—আহা, তাহলেততা খুবই ভালো হল। কতদিন চা পেটে পড়ে নি।

অনঙ্গ-বৌ চিন্তিত মুখে বললে—কিন্তু নুন-চা খেতেহবে। দুধ নেই।

—তাই দাও মা। লবণ-চা আমি বড্ড ভালোবাসি।

শুধু একবাটি নুন-চা। তা ছাড়া অনঙ্গ-বৌয়ের কিছু দেবার উপায়ও ছিল কি ?

রাত্রে গঙ্গাচরণ এসে দুর্গা পণ্ডিতকে দেখে মনে মনেভারি চটে গেল। স্ত্রীকে বললে—জুটেচে ওটা আবার এসে?

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—জুটেছে ! তা কি হবেএখন ?

চলে যেতে বলতে পারলে না ?কি খেতে দেবে শুনি?

—তুমি আমি দেবার মালিক ?যিনি দেবার তিনিইদেবেন।

—হ্যাঁ, তিনি তো দিলেন দুবেলা। তাহলে ওকেও তোতিনি দিলেই পারতেন। তোমার স্কন্ধে নিয়ে এসে চাপালেনকেন ?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই তাঁর নামে। তিনি ঠিক জোটাবেন। এখানে যিনি পাঠিয়েছেন, এও তাঁর কাজ।যোগাবেন তিনি।

—বেশ, যোগান তবে। দেখি বসে বসে।

—নাও, হাত-পা ধুয়ে—এখন নুন-চা খাবে একটু ?

দুর্গা পণ্ডিত বেশ শেকড় গেড়ে বসে গেল সেদিন থেকে, মনে হল গঙ্গাচরণের। মনে মনে বিরক্ত হলেও গঙ্গাচরণ মুখে কিছু বলতে পারে না। দেখতে দেখতে তিন দিন দিব্যি কাটিয়েদিলে। অনঙ্গ-বৌয়ের আশ্রিত জীব, কোথা থেকে এনে যে ওকে অনঙ্গ-বৌ খাওয়ায়, কেউ বলতে পারে না।

সেদিন দুর্গা পণ্ডিতকে বসে সামনের বেড়া বাঁধতে দেখেগঙ্গাচরণ বিরক্ত হয়ে বললে—ও কাজ করতে আপনাকে কেবলেচে ?

দুর্গা পণ্ডিত থতমত খেয়ে বললে—বসে বসে থাকি, বেড়াটা বাঁধি ভাবলাম।

—না, ও রাখুন। ও আপনাকে করতে হবে না। হাবু বাঁধবে এখন।

—ও ছেলেমানুষ, ও কি পারবে ?

—খুব ভালো পারে। আপনার হাতে এখুনি দায়ের কোপলেগে যাবে। এখন ও রাখুন।

দুর্গা পণ্ডিত একটু কুণ্ঠিত হয়েই থাকে। সংসারেরএটা-ওটা করবার চেষ্টা করে, তাতে গঙ্গাচরণ আরো চটেযায়। এর মতলবখানা কি, তাহলে এখানেই থেকে যেতেচায় নাকি ?অনঙ্গ-বৌ দিব্যি ওকে চা খাওয়াচ্চে, খাবার যে খাওয়াচ্চে এমন নয়। স্ত্রীকে কিছু বলতেও সাহস করে না গঙ্গাচরণ।

চালের অবস্থা ভীষণ। এর ওর মুখে শুধু শোনা যাচ্চেচাল কোথাও নেই। একদিন সাধু কাপালী সন্ধান দিলে, কুলেখালিতে এক গোয়ালার বাড়িতে কিছু চাল বিক্রি আছে।কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হল না। তবুও গরজ বড় বালাই, সাধু কাপালী ও সে দুজনে সাত ক্রোশ হেঁটে কুলেখালিগ্রামে উপস্থিত হলএদিকে রেল-টেল নেই, বড় বাজার গঞ্জনেই—চাল থাকতেও পারে বিশ্বাস হল গঙ্গাচরণের।

খুঁজে খুঁজে সেই গোয়ালা-বাড়ি বারও হল। ব্রাহ্মণ দেখেগৃহস্বামী ওকে যত্ন করে বসাল, তামাক সেজে নিয়েএল।

গঙ্গাচরণ বললে—জায়গাটা তোমাদের বেশ।

আসল কথা কিছু বলতে সাহস করছে না, বুক টিপ ঢিপ করচে। কি বলে বসে কি জানি ! চাল না পেলে উপোসশুরু হবে সবসুদ্ধু।

গৃহস্বামী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে ম্যালেরিয়া খুব।

—সে সর্বত্র।

—আপনাদের ওখানেও আছে ?নতুন গাঁয়ে বাড়ি আপনার, সে তো নদীর ধারে !

—তা আছে বটে, তবু ম্যালেরিয়াও আছে।

—এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায় ?

—তোমার এখানেই আসা।

—আমার এখানেই ?সে আমার ভাগ্যি। ব্রাহ্মণের পায়েরধুলো পড়লো। তা কি মনে করে?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো ?

—সে কি কথা বাবাঠাকুর ! আমাদের কাছে ও কথাবলতে নেই। বলুন কি জন্যে আসা ?

—তোমার বাড়ি চাল আছে সন্ধান পেয়ে এসেছি। দিতেইহবে কিছু। না খেয়ে মরচি একেবারে।

গৃহস্বামী কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললে—আপনাকে বলেছে কে ?

—আমাদের গ্রামেই শুনেছি।

—বাবাঠাকুর, চাল আমার আছে, মিথ্যে কথা বলবোনা, আপনি দেবতা। কিন্তু সে চাল বিক্রি করবার নয়।

—কত আছে বলবে ?

—তিন মণ। নুকিয়ে রেখেছিলাম, যেদিন গবর্নমেন্টেরলোক আসে কার ঘরে কত চাল আছে দেখতে, সেদিন মাটিরমধ্যে পুঁতে রেখেছিলাম বলে চালগুলো একটু গুমো গন্ধহয়ে গিয়েছে। ধান নেই, শুধু ওই চাল কটা সম্বল। ও বিক্রিকরলি—আমরা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, রাগ করবেননা, অভিসম্পাত দেবেন না বাবাঠাকুর। দিতি পারলি দিতাম। ওই কটা চাল ছাড়া আমার আর কোনো সম্বল নেই। ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

চাল পাওয়া গেল না। ফিরে আসবার পথে গঙ্গাচরণচোখে অন্ধকার দেখলে। সাধু কাপালীও সঙ্গে ছিল ওর।ক্রোশ দুই এসে ওদের বড় খিদে ও জলতেষ্টা পেল। সাধুবললে—পণ্ডিত মশাই, আর তো হাঁটা যায় না।

—তাই তো দেখছি, কাছে কি গাঁ ?

—চলুন যাই, বামুনডাঙ্গা-শেরপুর সামনে, তার পরেঝিকরহাটি।

বামুনডাঙা-শেরপুর গ্রামে ঢুকেই ওরা একটা বড়আটচালা ঘর দেখতে পেলে। সাধু কাপালী বললে—চলুন এখানে। ওরা একটু জল তো দেবে !

গৃহস্বামী জাতিতে সদগোপ, ওদের যত্ন করে বসালে।গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেতে দিলে। তারপর একটা বাটিতে খানিকটা আখের গুড়নিয়ে এল, জল নিয়ে এল।বললে—এবেলা এখানে দুটো রসুই করে খেয়ে যেতে হবে।

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হয়ে বললে-রসুই ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর। তবে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ আরো আশ্চর্য হয়ে বললে—তবে ?

—বাবাঠাকুর চাল তো অনেকদিনই নেই গাঁয়ে। দিনদশেক থেকে কেউ ভাতের মুখ দেখে নি এখানে।

—তবে কি রসুই করবো ?

—বাবাঠাকুর বলতে লজ্জা করে, কলাই-সেদ্ধ খেয়েসব দিন গুজরান করচে। বড়-ছোট সবাই। আপনাকেও তাইদেবো। আর লাউ-ডাঁটা চচ্চড়ি। ভাতের বদলে আজকাল সবাই ওই খাচ্চি এ গাঁয়ে।

সাধু কাপালী তাতেই রাজী। সে বেচারি দুদিন ভাত খায়নি—ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণ বললে-বাপু যা আছেবের করে দাও।

সেদ্ধ কলাই নুন আর লঙ্কা, তার সঙ্গে বেগুনপোড়া।সাধু কাপালী খেয়ে উঠে বললে—উঃ, এতও অদেষ্টে ছিল পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গাচরণ বললে—একটা হদিস পাওয়া গেল, এ জানতাম না সত্যি বলছি। কিন্তু এ খেয়ে পেটে সইবে কদিন তাই ভাবছি।

সন্ধ্যার দিকে শুধু হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরলো, কেবল সাধু কাপালী গোটাকতক বেগুন দিয়েছে। সাধু গরিব লোক নয়, তরি-তরকারি বেচে সে হাটে-হাটে তিন-চার টাকা উপার্জনকরে, কিন্তু টাকা দিয়েও চাল মিলচে কোথায় ?

দুর্গা, অনঙ্গ-বৌও ছেলেদের কারো খাওয়া হয়নি, ওদেরমুখ দেখে বুঝতে পারলে গঙ্গাচরণ। ও নিজেতবুও যা হোকদুটো কলাই সিদ্ধও খেয়েছে। অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে চালের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না। গঙ্গাচরণহাত-পা ধুয়ে বসলে চা করে ও নিয়ে এল। দুর্গা নিজেও আজ চালের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। কোথাও সন্ধান মেলে নি। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—খাবে এখন ?গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সঙ্গে খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলে থালার একপাশে শুধু তরকারি, ভাত নেই—খানিকটা বেশি করে মিষ্টি কুমড়ো সেদ্ধ, একটু আখের গুড়। স্ত্রী যেন অন্নপূর্ণা, এও তো কোথা থেকেজোটাতে হয়েছে ওকেই !

গঙ্গাচরণ কিছু ঠিক করতে পারে না ভেবে ভেবে।রোজ রোজ এই খেয়ে মানুষ কি বাঁচে ! স্ত্রীকে বললে—আরএক খাবার দেখে এলুম বামুনডাঙা-শেরপুরে। সেখানে সবাইকলাই সেদ্ধ খাচ্চে—খাবে একদিন ?

অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চেয়ে ওর মনে হল এই কদিনে ও রোগা হয়ে পড়েছে। বোধ হয় পেট পুরে খেতে পায় নানিজে, আর ওই বুড়োটা এসে এই সময় স্কন্ধে চেপে আছে। বুড়োকে খাওয়াতে গিয়ে ওর নিজের পেটে কিছু যাচ্চে নাহয়তো। নাঃ, এমন বিপদেও পড়া গিয়েছে।অনঙ্গ-বৌ কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকেকে বলে উঠলো—ও বামুন-দিদি—

অনঙ্গ-বৌ বাইরে এসে দেখলে ভাতছালার মতি-মুচিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে। শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে উলি-দুলি ছেঁড়া কাপড়, মাথার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়চে।

ওকে দেখে মতি হাসতে গেল। কিন্তু শীর্ণ মুখের সব দাঁতগুলো বেরিয়ে হাসির মাধুর্য গেল নষ্ট হয়ে। সর্বপ্রথমেঅনঙ্গ-বৌ প্রশ্ন করলে—কেমতি ! খাস নি কিছু ?আয়-বোস।

তারপর দু'মিনিটের মধ্যে দেখা গেল টেমি জ্বেলেউঠোনে একখানা কলার পাত পেতে মতিকে বসিয়ে দিয়েঅনঙ্গ-বৌ ওকে খেতে দিয়েছে, সেই মিঠে কুমড়ো সেদ্ধ আরলাউশাক চচ্চড়ি। মতি বললে—দুটো ভাত নেই বামুন-দিদি ?অনঙ্গ-বৌ দুঃখিত হল।

না মতি-মুচিনীর মুখে নিরাশার চিহ্ন। ভাত দিতে পারলে ওর পাতে অনঙ্গ-বৌ। একদানা চাল নেই ঘরে কদিন। এই সব খেয়ে চলচে সবারই। তাও যে মেলে না। লাউশাকআর কুমড়ো কত কষ্টে যোগাড় করা।

অনঙ্গ-বৌ আদর করে বললে—আর কি নিবি মতি ?

মতি হেসে বললে—মাছ দ্যাও, মুগির ডাল দ্যাও, বড়িচচ্চড়ি দ্যাও—

—দেবো, তুই খা খা—হ্যাঁরে, ভাত পানি কদিন রে ?

মতি চোখ নীচু করে কলার পাতার দিকে চেয়েবললে—পনেরো-ষোল দিন আজ সুদ্ধু কচু সেদ্ধ আর পুঁইশাক সেদ্ধ খেয়ে আছি। আর পারি নে বামুন-দিদি—তাই জোটাতে পাচ্ছি নে। ভাবলাম আর তো মরেই যাবো, মরবারআগে বামুনদিদির বাড়িতে দুটো ভাত খেয়ে আসি।

অনঙ্গ-বৌ চোখের জল মুছে দৃপ্তকণ্ঠে বললে—মতি, তুই থাক আজ। ভাত তোকে আমি কাল খাওয়াবোই ! যেমনকরে পারি।

মতি-মুচিনীকে দুদিন অন্তর যাহোক দুটি ভাত দেয়অনঙ্গ-বৌ।

কোথা থেকে সে ভাত যোগাড় হয়, তা তাকে কেউজিজ্ঞেস করে না। দুর্গাবুড়ো বাড়ি গিয়েচে কামদেবপুরে, কিন্তুগঙ্গাচরণের দৃঢ়বিশ্বাস, ও ঠিক আবার এসে জুটবে। এ বাজারেএমন নির্ভাবনায় আহার জুটবে কোথা থেকে?

সেদিন মতি দুপুরে এসে হাজির। ওর পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়, মাথায় তেল নেই। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—মতিতেল দিচ্ছি, একটা ডুব দিয়ে আয় দিকি !

—পেট জ্বলচে বামুন-দিদি। কাল ভাত জোটে নি, নেয়ে এলেই পেটে আগুন জ্বলে উঠবে।

—তুই যা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

মতি-মুচিনী নির্বোধ মেয়ে নয়, সে চুপ করে থেকেবললে—না, তোমাদের এখানে আর খাবো না।

—কেন রে ?

—তুমি পাবে কোথায় বামুন-দিদি যে রোজ রোজ দেবে?

—সে ভাবনা তোর নয়, আমার। তুই যা দিকি, নেয়েআয়—

মতি-মুচিনী স্নান সেরে এল। একটা কলার পাতেআধপোয়াটাক কলাইসিদ্ধ ও কিসের চচ্চড়ি। অনঙ্গ-বৌ ধরাগলায় বললে—ওই খামতি।

মতি অবাক হয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চয়ে বললেতোমাদেরও এই শুরু হয়েছে ?

—তা হয়েছে।

—চাল পেলে না ?

—পঞ্চান্ন টাকা মণ। দাম দিলে এখুনি মেলে হয়তো।

—কিন্তু এ তোমরা খেয়ো না বামুন-দিদি।

—কেন রে ?

—এ কি তোমাদের পেটে সহ্যি হয় ?আমাদের তাইসহ্যি হয় না।

—তুই খা খা—এত বক্তিমে দিতে হবে না তোকে।বিকেলে মতি এসে বললে—বামুন-দিদি, এক জায়গায়মেটে আলু আর বুনো শোলা কচু হয়েচে জঙ্গলের মধ্যে। একটা শাবলটাবল দ্যাও, কেউ এখনো টের পায় নি, তুলে আনি।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুই একলা পারবি আলু তুলতে ?

—কেন পারবো না ?দ্যাও একখানা শাবল—

—খাস নি, দুর্বল শরীর, ভিরমি লেগে পড়ে যাবি ! তুইআর আমি যাই—

এই সময় কাপালীদের ছোট-বৌ এসে জুটলো।বললে— কি পরামর্শ হচ্চে তোমাদের গা ?

অতএব ছোট-বৌকেও ওদের সঙ্গে নিতে হল।

গ্রামের উত্তর মাঠের নিচেই সবাইপুরের বাঁওড়।বাঁওড়ের ধারে খুব জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একটা শিমুলগাছমাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যাঁড়াগাছের দুর্ভেদ্য ঝোপের মধ্যেহামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ওরা এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, কিন্তু অনঙ্গ-বৌ আরকাপড় ছাড়াতে পারে না। কি বিশ্রী কাটা !

মতি-মুচিনী বিরক্ত হয়ে বললে—তখুনি বললাম তুমিএসো না। এখানে আসা কি তোমার কাজ ?কক্ষনো কি এসব অভ্যেস আছে তোমার ?সরো দেখি—

মতি এসে কাঁটা ছাড়িয়ে দিলে।

অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—ছুঁলি তো সন্দেবেলা ?

মতি হেসে বললে—নেয়ে মরো এখন বামুন-দিদি।

—যা যা, আর মজা দেখতে হবে না তোমার—ঢেরহয়েচে।

আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। মস্ত বড় মেটে আলুলতার গোড়া খুঁড়ে সের পাঁচ-ছয় ওজনের বড় আলুটা তুলতেওরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেছে। মতি-মুচিনী মাটি মেখেভূত হয়েছে, কাপালী-বৌ লতার জঙ্গল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তেহাত লাল করে ফেলেচে, অনঙ্গ-বৌ একটু আনাড়ির মতোআলুর একদিক ধরে বৃথা টানাটানি করচে গর্ত থেকে সেটাকেতুলবার প্রচেষ্টায়।

কাপালী-বৌ হেসে বললে—রাখো রাখো বামুন-দিদি, ওতোমার কাজ নয়। দাঁড়াও একপাশে—

বলে সে এসে দু'হাত দিয়ে টানতেই আলুটা গর্ত থেকেবেরিয়ে এল।

অনঙ্গ-বৌ অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে—আমিপারলাম না—বাবাঃ—

—কোথা থেকে পারবে বামুন-দিদি-নরম রাঙা হাতেরকাজ নয় ওসব।

—তুইযা—তোকে আর ব্যাখ্যান কত্তেহবেনামুখপুড়ী—এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো। সেই ঘন ঝোপের দুর প্রান্তে একজন দাড়িওয়ালা জোয়ান মতো চেহারার লোকেরআকস্মিক আবির্ভাব হল। লোকটা সম্ভবত মেঠো পথ দিয়েযেতে যেতে নদীতীরের ঝোপের মধ্যে নারীকণ্ঠের হাসি ওকতাবার্তা শুনতে পেয়ে এদিকে এসেছে। কিন্তু তার ধরনধারণ ও চলনের ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি দেখে সর্বপ্রথমে অঙ্গন-বৌয়েরমনে সন্দেহ জাগল। ভালো নয় এ লোকটার মতলব। ঝোপেরমধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েকে দেখে ও কেনএদিকেই এগিয়ে আসছে ?যে ভদ্র হবে, সে এমন অদ্ভুতআচরণ কেন করবে ?

মতি এগিয়ে এসে বললে—তুমি কে গা ?এদিকিমেয়েছেলে রয়েছে—এদিকি কেন আসছো ?

কাপালী-বৌও জনান্তিকে বললে—ওমা, এ ক্যামন্‌ধারানোক গা ?

লোকটার নজর কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে, অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। সে হন্‌ হন্‌ করে সোজা চলেআসচে অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে। অনঙ্গ-বৌ ওর কাণ্ড দেখেভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মতির পেছনদিকে গিয়ে দাঁড়ালো।তার বুক ঢিপ ঢিপ করচে—ছুটে যে একদিকে পালাবে এতেমন জায়গাও নয়। তখনো লোকটা থামে নি।

মতি চেঁচিয়ে উঠে বললে—কেমন নোক গা তুমি ?ঠেলেআসচো যে ইদিকে বড়ো ?

কাপালী-বৌ এসময়ে আরো পিছিয়ে। কারণ কাছাকাছিএসে লোকটা ওর দিকেও একবার কট্‌মট্‌ করে চেয়েছে—মুখেকিন্তু লোকটা কোনো কথা বলে নি।

এদিকে অনঙ্গ-বৌয়ের মুশকিল হয়েচে, ছুটে পালাতে গিয়ে ওর চুল জড়িয়ে গিয়েচে শেয়াকুল বাঁটায় কাঁচ লতায়। বসন হয়ে গেছে বিস্রস্ত। ঘামে ও পরিশ্রমে মুখ হয়েছেরাঙা। লোকটা ওর দিকে যেন অগ্নিশিখার দিকে পতঙ্গের মতোছুটে আসচে—কাছে এসে যেমন খপ্‌ করে অনঙ্গ-বৌয়ের হাত ধরতে যাবে, মতি তাকে প্রাণপণ শক্তিতে মারলে এক ঠ্যালা।সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ-বৌ বলে উঠলো—খবরদার ! কাপালী বৌহাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

লোকটা ধাক্কা খেয়ে মেটে আলুর গর্তের মধ্যে পড়েগেল।

ততক্ষণ মতি এসে অনঙ্গ-বৌকে কাঁটার বাঁধন থেকে মুক্তকরবার প্রাণপণে চেষ্টা করচে। তার তখন রণরঙ্গিণী মূর্তি। সেচেঁচিয়ে বললে—তোল্‌ তো শাবলটা কাপালী-বৌ—মিনসেরমুণ্ডুটা দিই গুঁড়ো করে ভেঙে—এত বড় আস্পদ্দা !

অনঙ্গ-বৌ ষাঁড়াঝোপের নিবিড়তম অংশে ঢুকে গিয়েচে ততক্ষণ, ও ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। কারণ ঝোপ থেকেবেরুবার পথ নেই বাইরে, সে সুঁড়ি পথটাতে ওর আর মতির যুদ্ধ চলছিল। লোকটা গর্ত থেকে উঠবার চেষ্টা করচে, মতিকাপালী-বৌয়ের হাত থেকে শাবলটা নিচ্চে—এই পর্যন্তঅনঙ্গ-বৌ দেখতে পেল। পালাবার পথ বন্ধ। অনঙ্গ-বৌযেখানে ঢুকেচে সেখানে মানুষ আসতে হলে তাকে হামাগুড়িদিয়ে চার হাতে-পায়ে আসতে হবে। বিষম কুঁচ কাঁটারলতাজাল। মাথার ওপর শাবল হাতে মতি মুচিনী রণরঙ্গিণীমূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

লোকটা নিজের অবস্থা বুঝল। মতির হাত থেকে শাবল কেড়ে নেওয়া অত সহজ হবে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সে সে-পথেই এক-পা দু-পা করেপিছু হঠতে লাগলো।

একেবারে ঝোপের প্রান্তসীমায় পৌঁছে লোকটা হঠাৎপিছন ফিরে দিলে দৌড়। মতি-মুচিনী বললে—বেরিয়ে এসোগো বামুনদিদি—পোড়ারমুখো মিন্‌সে ভয় পেয়ে ছুট দিয়েছে।

অনঙ্গ-বৌ তখনো কাঁপছে, তার ভয় তখনো যায় নি।কাপালী-বৌ ভয় পেলেও অনঙ্গ-বৌয়ের মতো ভয় পায় নি বাতার অতটা ভয় পাওয়ার কারণও ঘটেনি। সে হেসে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসি আসচেকিসে পোড়ারমুখে ?চুপ, ছুঁড়ির রঙ্গ দ্যাখো না—

মতি-মুচিনী বললে—ওই বোঝো।

সবাই মিলে এমন ভাবটা করলে যেন সব দোষটা ওরই।

কাপালী-বৌয়ের বয়স কম, সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছেকৌতুকজনক বলে মনে না হলে সে হাসে নি—হাসি চাপবারচেষ্টা করতে করতে বললে—ওঃ, মতি-দিদির সে শাবলতোলার ভঙ্গি দেখে আমার তো—হি-হি-হি—

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসে।

—নাও, নাও, বামুন-দিদি আর রাগ কোরো না

—হয়েছে, এখন চলো এখান থেকে বেরিয়ে—বেলানেই।

এতক্ষণ ওদের যেন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না—এখন হঠাৎঝোঁপ থেকে উঁকি মেরে সবাই চেয়ে দেখলে সবাইপুরের বাঁওড়ের ওপারে নোনাতলা গ্রামের বাঁশবনের আড়ালেকতক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়েচে, ঘন ছায়া নেমে এসেছেবাঁওড়ের তীরে তীরে, বাঁওড়ের জলের কচুরিপানার দামের ওপর। আবার কি উৎপাত না জানি হয়, সন্ধেবেলা ! মাত্রতিনটি মেয়েছেলে তেপান্তর মাঠের মধ্যে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বাবাঃ—এখন বেরোও এখানথেকে।

মতি বললে—বা রে, মেটে আলুটা ?

—কি হবে তাই ?

—অত বড় মেটে আলুটা ফেলে যাবা ?কাল থাকবে ?এই মন্বন্তরের সময় ?

কথাটা সকলেরই প্রাণে লাগলো। থাকবে না মেটে আলু।আজকাল গ্রামের লোক সব যেন কেমন হয়ে উঠেছে। সন্ধানপাবেই।

কাপালী-বৌ বললে—তাই করো বামুন-দিদি। আলুটানেওয়া যাক—নোক সব হন্যে হয়ে উঠেচে না খেতি পেয়ে।বুনো কচু আলু কিছু বাদ দিচ্ছে না, সব্বদা খুঁজে বেড়াচ্চে বনেজঙ্গলে। ওই আলুটা তুললে আমাদের তিন বেলা খাওয়া হবে।

আবার সবাই মিলে আলুর পিছনে লাগলো এবং যখনসকলে মিলে গর্ত হতে মেটে আলুটা বের করে উপরে তুলেধুলো ঝাড়ছে—তখন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার মাঠ-বন ঘিরেফেলেছে। মতি-মুচিনী নিজেই অত বড় ভারি আলুটা নিয়েচললো, মধ্যে অনঙ্গ-বৌ, পেছনে শাবল হাতে কাপালী-বৌ। ওরা সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাইতেচাইতে গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকলো।

গ্রামে ঢুকবার আগে অনঙ্গ-বৌ বললে—এই ছুঁড়ি, আজকের কথা ওই সব যেন কাউকে বলিস নে—

কাপালী-বৌ ঘাড় নেড়ে বললে—নাঃ

—বড্ড পেট-আল্‌গা তুই, পেটে কোনো কথা থাকে না —

—কেন, কবে আমি কাকে কি বলিচি ?

—সে হিসেব এখন বসেবসে দেবার সময় নেই—মোটেরওপর একথাকারো কাছে—

—কোন্ কথা ?মেটে আলুর কথা ?

—আবার ন্যাকামি হচ্চে ?দ্যাখ ছুটকি, তুই কিন্তু দেখবি মজা আমার হাতে আজ। তুমি বুঝতে পারছো না কোন্ কথা ?নেকু !

কাপালী-বৌ আবার হি-হি করে হেসে ফেললে—কিকারণে কে জানে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এই পাগলকে নিয়ে আমি এখন কি করি ?তুই বলবি ঠিক—না ?

কাপালী-বৌ হাসি থামিয়ে আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে—পাগল বামুন-দিদি। তোমায় নিয়ে যখন কথা, তখনজেনো, কাগ-পক্ষিতেও একথা টের পাবে না। মাথার ওপর চন্দ্র-সূয্যি নেই ?

বাড়ি এসে আলুর ভাগ নিয়ে চলে গেল যে যার ঘরে।

গঙ্গাচরণ বেরিয়েছিল চাল যোগাড়ের চেষ্টায়। কিন্তু ন'হাটার হাটে ঘোর দাঙ্গা আর লুটপাট হয়ে গিয়েচে চালেরদোকানে। পুলিশ এসে অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছে।গঙ্গাচরণ বর্ণনা করে স্ত্রীর কাছে বসে সন্ধ্যার পরে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এখন উপায় ?

—উপবাস।

অনঙ্গ-বৌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলে সে উপোস করতে ভয় খায় না, উপোস কি করে নি এর মধ্যে ?কিন্তু এই যেউনি শুকনো মুখে এত দূর থেকে এসেছেন ফিরে, ওঁকে এখন সে কি খেতে দেবে এই মেটে আলু সিদ্ধ ছাড়া ?বাধ্য হয়ে দিতে হল তাই—শুধু মেটে আলু সিদ্ধ, এক তাল মেটে আলুসিদ্ধ। সবাইকে তাই খেতে হল। দুর্গা পণ্ডিত সম্প্রতি বাড়িচলে গিয়েছে। তবুও আলু সেদ্ধ খানিকটা বাঁচবে। হাবু খেতেবসে বললে—এ মুখে ভালো লাগে না মা—

অনঙ্গ বললে—এ ছেলের চাল দ্যাখ না ?মুখে ভালো না লাগলে করচি কি ?

মতি-মুচিনী খেতে এল না, কারণ সে ভাগের আলু নিয়ে গিয়েচে, আলাদা করে আলু সেদ্ধ বা আলু পোড়া খেয়েচে।

পরদিনও আলু সেদ্ধ চললো। এ কি তাচ্ছিল্যের দ্রব্য ?কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তবে ওইটুকু আলু সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে—ছেলের মুখে ভালো লাগে না তো সে কিকরবে ?

রাত্রিতে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, চাল না পাও, কিছুকলাই আজ আনো। আলু ফুরিয়েচে।

—তাই বা কোথা থেকে আনি ?

পরামাণিকদের দোকানে নেই ?

—সব সাবাড়। গুদোম সাফ।

—কি উপায় ?

—কিছু নেই ঘরে ?আলুটা ?

—সে আর কতটুকু ?কাল ফুরিয়েছে। তবুও তো এবার পণ্ডিত ঠাকুর নেই—মতি নেই—নিজেরাই খেয়েছি।

কাল থেকে কি হবে তাই ভাবচি—

—চাল কোথাও নেই ?

—আছে। পঁয়ষট্টি টাকা মণ, নেবে ?পারবে নিতে?অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—আমার হাতের একগাছা রুলি আছে, তাই বেচে চাল নিয়ে এসো।

তিনদিন কেটে গেল।

চাল তো দূরের কথা, কোনো খাবারই মেলে না।কলাইয়ের মণ ষোল টাকা, তাও পাওয়া দুষ্কর।কাপালী-বৌ না খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েচে, তারচেহারার আগের জলুস আর নেই। সন্ধ্যাবেলা পা টিপে টিপে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে এসে বললে—কি করচো বামুন-দিদি ?

—বসে আছি ভাই, রান্না-বান্না তো নেই।

—সে তো কারো নেই।

—কি খেয়েছিস ?সত্যি বলবি ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

অনঙ্গ-বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজলো। কিছুই পেলে না। তার ধারণা ছিল কাল রাত্রের আধখানা নারকোল বোধ হয় ঘরের কোথাও আছে, কিন্তু খিদের জ্বালায়ছেলেরা বোধ হয় কখন শেষ করে দিয়েছে, সে দেখেনি।

কাপালী-বৌ ওর দিকে চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। ওকে দেখে কষ্ট হয়।

একটু কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আজ যাবো।অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়-সুরে বললে—কোথায় যাবি ?

—ইটখোলায়।

—কোন্ ইটখোলায় ?

—দীঘির পারের বড় ইটখোলায়—জানো না ?আহা !কাপালী-বৌ যেন ব্যঙ্গের সুরে কথা শেষ করলে।অনঙ্গ-বৌ বললে—সেখানে কেন যাবি রে ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইলে নিচু চোখে। অনঙ্গ-বৌবললে—ছুট্‌কি !

—বলো গে তুমি বামুন-দিদি। তোমার মুখের দিকে চেয়েআমি এতদিন জবাব দিই নি। আর পারি নে না খেয়ে—নাখেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি ?আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামুনদি, পাপ হয়ে নরকে পচে মরবো সেও ভালো—

অনঙ্গ কোনো কথা বলবার আগে কাপালী-বৌ ততক্ষণহন্ হন্ করে চলেচে বেড়ার বাইরের পথে।

অনঙ্গ-বৌ পিছনে ডাক দিলে—ও বৌ শুনে যা, যাস নি, —শোন্ ও বৌ—

পুরোনো ইটখোলার এদিকে একটা বড় শিমুল গাছেরতলায় অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে। কাপালী-বৌ আনাড়িরমতো অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পথ চলে সেখানে পৌঁছলো।

দাঁড়িয়ে আছে পোড়া-যদু—বাল্যে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল, এখনো সে দাগ মেলায় নি—তাই ওর ওই নাম গ্রামের মধ্যে।পোড়া-যদুও বলে, আবার যদু-পোড়াও বলে। যদু ইটখোলায় কাঠ যোগান দেওয়ার ঠিকাদার। মোটা পয়সা রোজগার করে।

যদু-পোড়া ওকে দেখতে পেয়ে বললে—এই যে, ইদিকি !

কাপালী-বৌ ভেংচি কেটে বললে—ইদিকি ! দেখতেপেইচি। এ অন্ধকারে আর ও ভূতের রূপ চোখ মেলে দেখতিচাইনে। আঁতকে ওঠবো।

যদু-পোড়া শ্লেষের সুরে বললে—তবু ভালো। তবুওযদি—

কাপালী-বৌ বাধা দিয়ে না থামিয়ে দিলে যদু-পোড়াএকটা কি অশ্লীল কথার দিকে ঝুঁকেছিল।

থামিয়ে দিয়ে নীরস রুক্ষসুরে বলে—কই চাল ?

—আছে রে আছে—

—না, দেখি আগে। কত কটি?

—আধ পালি। তাই কত কষ্টে যোগাড় করা। শুধু তোকেকথা দিইচি বলে।

—কে তোমার কাছে কথা পেড়েছিল আগে ?আমারকাছে তুমি কখন কথা দিইছিলে ?বাজে কথা কেন বলো ?আমি দেরি করতে পারবো না—সন্দে হয়ে গিয়েছে—দেখিচাল আগে—তোমাকে আমার বিশ্বাস নেই—

যদু-পোড়া নিজের সততার প্রতি এ রূঢ় মন্তব্যে হঠাৎবড় অবাক হয়ে উঠে কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাপালী-বৌ আবার ধমক দিয়ে বলে উঠলো—আমি চলেযাচ্ছি কিন্তু। সারারাত এ শিমুলতলায় তোমার মতো শ্মশানেরপোড়া কাঠের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতি হবে নাকি ?চললাম আমি—

যদু-পোড়া ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে-শোন্ শোন্-যাসনে—বাবাঃ, এ দেখচি ঘোড়ায় জিন দিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা—এইদ্যাখ চাল—এই ধামাতে—এই যে—বাপ রে, কি তেজ!

কাপালী-বৌ সদর্পে বললে—চুপ !

—আচ্ছা আচ্ছা, কিছু বলচি নে-তাই বলচি যে—

কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল ! পেছনে পেছনে আসছে যদু-পোড়া।অন্ধকার পথের দু'ধারে আশসেওড়া বনে জোনাকি জ্বলচে।

কাপালী-বৌ তিরস্কারের সুরে বললে-পেছনে পেছনেকোন্ যমের বাড়ি আসছো ?

—তোকে একটু এগিয়ে দি—

—ঢের হয়েছে। ফিরে যাও—

—অন্ধকারে যাবি কি করে ?

—তোমার সে দরদে কাজ নেই—চলে যাও—

—গাঁয়ের লোক এ পথে আসবে না, ভয় নেই—

—সে ভয় করি নে আমি—আমাকে সবাই চেনে—তুমিযাও চলে—

তবুও যদু-পোড়া পিছু পিছু আসচে দেখে কাপালী-বৌহঠাৎ দাঁড়িয়ে ঝাঁঝের সুরে বললে—যাও বলচি—কেনআসছো ?

যদু-পোড়া আদরের সুরে বললে—তুমি অমন করছো কেন হ্যাঁগো ! বলি আমি কি পর ?

কাপালী-বৌ নীরস কণ্ঠে বললে—ওসব কথায় দরকারনেই। তোমাকে উপকার করতে কেউ বলছে না, যাও বলচি, নইলে এ চাল সব ওই খানায় ফেলে দেবো কিন্তু।

যদু-পোড়া এবার থমকে দাঁড়ালো। বললে—যাচ্চি, যাচ্চি—একটা কথা—

—কি কথা ?

চাল আর কিছু আমি যোগাড় করচি—পরশু সন্দেবেলাআসিস।

—যাও তুমি—

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরের দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়েআছে, গঙ্গাচরণ কোথায় বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি।আধ-অন্ধকারে কে একজন দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে এসেদাঁড়ালো, অনঙ্গ-বৌ চমকে বলে উঠলো—কে ?

পরে ভালো করে চেয়ে দেখে বললে—আ মরণ ! মুখেকথা নেই কেন ?

কাপালী-বৌ মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হাসছে।অনঙ্গ-বৌ বললে—কি মনে করে ?

—একটু নুন দেবা ?

—দেবো। কোত্থেকে এলি ?

–এলাম।

—বোস না।

—বসবো না। খিদে পাই নি ?

—খাবি কি ?

কপালী-বৌ আঁচল দেখিয়ে বললে—এই যে !

—কি ওতে ?

—চাল—দেখতি পাচ্চ না ?নুন দ্যাও দিনি। খাই গিয়ে—

কোথায় পেলি চাল ? -বলবো কেন ?তুমি দুটো রাখো বামুন-দিদি।

অনঙ্গ-বৌ গম্ভীর সুরে বললে—ছুটকি, তোর বড় বাড়হয়েচে। যত বড় মুখ না তত বড় কথা—

—পায়ে পড়ি বামুন-দিদি। নাও দুটো চাল তুমি।

—তোর মুখে আগুন দেবো—

—আচ্ছা বামুন-দিদি, আমরা নরকে পচে মরবো ঠিকই, আমাদের কথা বাদ দাও তুমি। তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধুলো দিয়ো—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই—

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জল এল। সে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

কাপালী-বৌ বললে—নেবা দুটো চাল ?

—না, তুই যা।

—তবে মর গিয়ে। আমিই খাই গিয়ে। কই নুন দ্যাও—

নুন নিয়ে চলে গেল কাপালী-বৌ। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এস বললে, ও বামুন-দিদি, আজ তুমি কি খেয়েছ ?

—ভাত।

—ছাই ! সত্যি বলো ?

—যা খাই তোর কি ?যা তুই—

কপালী বৌ এগিয়ে এসে বললে—পায়ের ধুলো একটুদাও—গঙ্গা নাওয়ার কাজ হয়ে যায়—

বলেই সে অনঙ্গ-বৌয়ের দুই পায়ের ধুলো দুই হাতে নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে গঙ্গাচরণ এসে পড়াতে সে ছুটে পালালো।

—গঙ্গাচরণ বললে—ও কে গেল গা ?

—ছোট-বৌ কাপালীদের।

—কি বলছিল ?

—দেখা করতে এসেছিল। চাল পেলে ?

—এক জায়গায় সন্ধান পেয়েছি। ষাট টাকা মণ—ভাবছিকিছু বাসন বিক্রি করি।

—তাতে ষাট টাকা হবে ?

কুড়ি টাকা তো হবে। তেরো সের চাল কিনে আনি—আর না খেয়ে তো পারা যায় না, সত্যি বলছি—

তার চেয়ে আমার সোনা-বাঁধানো শাঁখাটা বিক্রি করেএস। বাসন থাক গে—

—তোমার হাতের শাঁখা নেবো ?

—না নিলে অনাহারে মরতে হবে। যা ভালো বোঝোতাই করো।

পরদিন গঙ্গাচরণ শাঁখাজোড়া গ্রামের সর্ব স্যাকরার দোকানে বিক্রি করলে। সর্ব স্যাকরা বললে—এ জিনিস বিক্রিকরবেন কেন ?

—দরকার আছে।

কিন্তু চাল পাওয়ার যে এত বিপুল বাধা তা গঙ্গাচরণজানতো না। শঙ্করপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়ি চালের সন্ধানএকজন দিয়েছিল। খুব ভোরে পরদিন উঠে সেখানে পৌঁছেদেখলে দশজন লোক সেখানে ধামা নিয়ে বসে। বাড়ির মালিকতখনো ওঠে নি। নিবারণ দোর খুলে বাইরে আসতেই সবাইমিলে তাকে ঘিরে ধরলে। সে বললে—আমার চাল নেই—

গঙ্গাচরণ বললে—সে আমি জানি। তবুও তোমার মুখে শুনবো বলে এসেছিলাম—

গঙ্গাচরণ সেখানেই বসে পড়লো। চাল না নিয়ে ফিরবে কেমন করে ?বাড়ির সকলেই আজ দু'দিন থেকে ভাত খায়নি। ছেলেদের মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অন্য কয়েকজন লোক যারা এসেছিল, তারা একে একে সবাই ফিরে গেল।নিবারণ ঘোষ বাইরের বাড়ি আর ভেতর বাড়ির মধ্যেকারদরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে নিবারণ ঘোষ আবার বাইরে এল।গঙ্গাচরণকে বসে থাকতে দেখে বললে—বাবাঠাকুর কি মনেকরে বসে ?চাল ?সে দিতে পারবো না। ঘরে চাল আছে, সেতোমার কাছে অস্বীকার করতে যাচ্চি নে—শেষে কি নরকেপচে মরবো ?কিন্তু সে চাল বিক্রি করলি এরপর বাচ-কাচনা খেয়ে মরবে যে !

—কত চাল আছে ?

—দু'মণ।

—ঠিক ?

—না ঠাকুরমশাই, মিথ্যে বলবো না। আর কিছু বেশিআছে। কিন্তু সে হাতছাড়া করলি বাড়িসুদ্ধ না খেয়ে মরবে।ট্যাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ?ও জিনিস পয়সা দিলি মেলবে না।

গঙ্গাচরণ উঠবার উদ্যোগ করচে দেখে নিবারণ হাত।জোড় করে বললে—একটা কথা বলি বাবাঠাকুর। ব্রাহ্মণমানুষ, এত দূর এয়েছেন চালির চেষ্টায়—আমি চাল দিচ্ছি, আপনি আমার বাড়িতে দুটো রান্না করে খান।

রসুই চড়িয়ে দিন গোয়ালঘরে। মাছ পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্চি, মাছেরঝোল ভাত আর গরুর দুধ আছে ঘরে। এক পয়সা দিতেহবে না আপনার।

গঙ্গাচরণ বললে—না, তা কি করে হয় ?বাড়িতে কেউ খায় নি আজ দু’দিন। ছেলেপিলে রয়েছে, তা হয় না। তুমিআমাকে রান্নার জন্যে তো চাল দিতেই, আর দুটো বেশি করেদাও। আমি দাম দিয়ে নেবো। ষাট টাকা করেই মণ দেবো, কিছু বেশি না হয় নাও।

নিবারণ কিছুতেই রাজী হল না। তার ওপর রাগ করা যায় না, প্রতি কথাতেই সে হাত জোড় করে, এখানে বসেখাওয়ার নিমন্ত্রণ তো করে রেখেচেই। গঙ্গাচরণ চলে আসছে, নিবারণ এসে পথের ওপরে আবার তাকে হাত জোড় করেরান্না করে খাওয়ার অনুরোধ জানালে।

গঙ্গাচরণ রাগ করে বললে—আমি কি তোমার বাড়িখেতে এসেছি ?যাও যাও—ওকথা বলো না—

কিন্তু গঙ্গাচরণের মনের মধ্যে আর সে জোর নেই। হঠাৎ তার মনের চক্ষে ভেসে উঠেছে, দিব্যি হিঙের টোপা টোপা বড়ি ভাসছে মাছের ঝোলে, আলু বেগুন, বড় বড়চিংড়ি মাছ আধ-ভাসা অবস্থায় দেখা যাচ্চে বাটির ওপর।ভাতে সেই মাছের ঝোল মাখা হয়েছে। কাঁচা ঝাল একটাবেশ করে মেখে...

নিবারণ বললে—আসুন, চলুন। আমার একথা আপনাকেরাখতেই হবে। সে শোনবো না আমি। দুপুরবেলায় না খেয়েবাড়ি থেকে ফিরে যাবেন ?

হাবু ভাত খায় নি আজ দু’দিন। অনঙ্গ-বৌ খায় নিদু’দিনেরও বেশি। ও যে কি খায়-না-খায় গঙ্গাচরণ তার খবর রাখে না। নিজে না খেয়েও সবাইকে যুগিয়ে বেড়ায়। তার খাওয়া কি এখানে উচিত হবে ?গঙ্গাচরণ বললে, আচ্ছা যদি খাই, তবে এক কাঠা চাল দেবে ?

—না বাবাঠাকুর। মিথ্যে বলে কি হবে ?চাল হাতছাড়াকরবো না। আপনি একা এখানে বসে আধ কাঠা চাল রেঁধেখান তা দেবো।

—তোমার জেদ দেখচি কম নয় !

—এই আকালে এমনি করেছে। ভয় ঢুকে গিয়েচে যে সবারই।

—চাল আর যোগাড় করতে পারবে না ?

—কোথা থেকে করবো বলুন ! কোনো মহাজনের ঘরে ধান নেই। বাজারে এক দানা চাল আসে না। আমাদেরগেরামের পেছনে একটা বিল আছে, জানেন তো ?দাসপাড়ারবিল তার নাম। এখন এই তো বেলা হয়েছে, গিয়ে দেখুনসেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়েমানুষ জুটেছে এতক্ষণ। জলেপাঁকের মধ্যি নেমে পদ্মগাছের মূল তুলছে, গেঁড়ি-গুগলিতুলছে—জল-ঝাঁঝির পাতা পর্যন্ত বাদ দেয় না।

—বল কি ?

—এই যাবার সময় দেখবেন সত্যি না মিথ্যে। যত বেলাহবে তত লোক বাড়বে, বিলির জল লোকের পায়ে পায়ে ঘোল দই হয়ে যাবে কাদা ঘুলিয়ে। এক-একজনের কাদামাখাপেত্নীর মতো চেহারা হয়েছে—তবুও সেই কাদা জলে ডুবদিয়ে পদ্মের মূল, গেঁড়ি-গুগলি এসব খুঁজে বেড়াচ্ছে। চেহারাদেখলি ভয় হয়। তাও কি পাচ্চে বাবাঠাকুর ?বিল তো আর অফুরন্ত নয়। যা ছিল, তিন দিনের মধ্যে প্রায় সাবাড় হয়েগিয়েছে। এখন মনকে চোখ ঠারা।

—তবে যাচ্ছে কেন ?

—আর তো কোথাও কিছু খাবার নেই। যদি তবুও বিলেরমধ্যি খুঁজলি পাওয়া যায়। ভেবে দেখুন বাবাঠাকুর, আপনাকেযদি চাল বেচি, তবে একদিন আমার বাড়ির ঝি-বউদের অমনিকরে পাঁক মেখে বিলের জলে নামতি হবে দুটো গেঁড়ি-গুগলিধরে খাবার জন্যি। চলুন বাবাঠাকুর, আসুন দুটো খেয়ে যান।পেট ভর্তি চাল দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ ফিরলো। মাছের ঝোল ভাত খায়—পেঁড়িগুগলি সেদ্ধ নয়। এখনো এ গ্রামে এ দিনেও ভাত খেতে পাওয়া যাচ্চে। এর পরে আর পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

গোয়ালঘর নিকিয়ে পুঁছেদিলে নিবারণের বিধবা বড়মেয়েক্ষ্যান্তমণি। কাঠ নিয়ে এক পাশে রাখলে। গঙ্গাচরণ পুকুরেরজলে স্নান করে আসতেই ক্ষ্যান্তমণি তসরের কেটে-কাপড়কুঁচিয়ে হাতে দিলে। রান্নার জন্য কুটনো-বাটনা সব ঠিক করে এনে দিলে। একবার হেসে বললে—দাদাঠাকুর, অতটা নুন ?পুড়ে যাবে যে বেন্নন !

—দেবো না ?

—বেন্নন মুখে দিতে পারবেন না। আপনার রসুই করবারঅভ্যেস নেই বুঝি ?

—না।

—আপনি বসে বসে রাঁধুন, আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

ক্ষ্যান্তমণি যে বেশ ভালো মেয়ে, গঙ্গাচরণ অল্প সময়েরই মধ্যেই তা বুঝতে পারলে। কোথা থেকে একটু আখের গুড়, গাওয়া ঘি যোগাড় করে নিয়ে আসে। যাতে গঙ্গাচরণেরখাওয়াটা ভালো হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য। খেতে বসেগঙ্গাচরণের কিন্তু ভাত যেন গলা দিয়ে নামে না—আশ্চর্যেরকথা, হাবুর জন্যে দুঃখ নয়, পটলার জন্যেও নয়—দুঃখ হলঅনঙ্গ-বৌয়ের জন্যে। সে আজ দু'দিন খায় নি। তার চেয়ে হয়তো আরো বেশি দিন খায় নি। মুখ ফুটে তো কোনো দিনকিছু বলে না।

—আর একটু আখের গুড় দি ?

—না। এ দুধ তো খাঁটি, গুড় দিলে সোয়াদ নষ্ট হয়েযাবে।

এমন ঘন দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সে খাচ্চে এখানে, ওখানে অনঙ্গ-বৌ হয়তো উঠোনের কাঁটানটের শাকের বনেচুবড়ি নিয়ে ঘুরচে, অখাদ্যকাঁটানটে শাক তুলবার জন্যে।নইলে বেলা হতে না হতে পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে জুটবে।তাদের উৎপাতে গাছের পাতাটি থাকবার জো নেই।

ক্ষ্যান্তমণি পান আনতে গেল। পাতে দুটি ভাত পড়েআছে—গঙ্গাচরণের প্রবল লোভ হল ভাত দুটি সে বাড়ি নিয়েযায়। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে ?চাদরের মুড়োয় বেঁধে ?ছিঃ

—সবাই টের পাবে। এঁটো ভাত ব্রাহ্মণ হয়ে চাদরের মুড়োয়বেঁধে নেবে ?

গঙ্গাচরণ বসে বসে মতলব ভাঁজতে লাগলো—কি করা যাবে ?বলা যাবে কি এই ধরনের যে, আমাদের বাড়ি একটা কুকুর আছে তার জন্যে ভাত কটা নিয়ে যাবো ! তাতে কে কি মনে করবে ?বড় লজ্জা করে যে ! অনেকগুলো ভাত নয় বটে, তবুও চার-পাঁচ গ্রাস হবে অনঙ্গ-বৌয়ের। বড় বড় চার-পাঁচ গ্রাস। নিয়ে যাবেই সে। কিসের লজ্জা ?এমন সময়ে ক্ষ্যান্তমণি এসে পান দিতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণেরসাহস চলে গিয়ে রাজ্যের লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে জুটলো।দিব্যি সুন্দরী মেয়ে, যৌবন-পুষ্ট দেহটির দিকে বার বার চেয়েদেখেও আশ মেটে না। কালো চুল মাথায় একটাল, নাকেরডগায় একটা ছোট্ট তিল। মুখে দু-দশটা বসন্তের দাগ আছেবটে, তবুও ক্ষ্যান্তমণির সুশ্রী মুখ।

গঙ্গাচরণ বললে—ক্ষ্যান্ত, তোমার বসন্ত হয়েছিল ?

—হ্যাঁ, দাদাঠাকুর। আজ তিন বছর আগে।

—ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুলে ও দাগ কটা আর থাকতো না।

—আপনিও যেমন দাদাঠাকুর ! আর কি হবে মুখেরচেহারা নিয়ে বলুন ?সে দিন চলে গিয়েচে—কপাল যেদিনপুড়েচে, হাতের নোয়া ঘুচেছে। এখন আশীর্বাদ করুন, যেনভালোয় ভালোয় যেতে পারি।

তারপর চুপি চুপি বললে—আপনি ওই পুকুরেরবাঁশঝাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকুন গিয়ে।

গঙ্গাচরণ সবিস্ময়ে বললে—কেন ?

—চুপ চুপ। বাবাকে লুকিয়ে দুটো চাল দিচ্ছি আপনাকে।কাউকে বলবেন না। আধ পালিটাক চাল আমি আলাদা করে রেখে দিইচি আপনার রান্নার চাল আনবার সময়ে। নিয়ে যানচাল কটা। আপনার মন খারাপ হয়েছে বাড়ির জন্যি আমি তা বুঝতে পেরেছি।

মেয়েরাই লক্ষ্মী। মেয়েরাই অন্নপূর্ণা। বুভুক্ষু জীবের অন্ন ওরাইদু'হাতে বিলোয়। ক্ষ্যান্তমণিকেআঁচলের মুড়োতে লুকিয়েচাল আনতে দেখে দূর থেকে গঙ্গাচরণের ওই কথাই মনে হল।ক্ষ্যান্ত গঙ্গাচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—হাতে করেদুটো চাল দেবো ব্রাহ্মণকে, এ কত ভাগ্যি। কিন্তু বাবাঠাকুর, যে আকাল পড়েছে, তাতে কাউকে কিছু দেবার জো নেই।সবই অদেষ্ট। লুকিয়ে নিয়ে যান—

—লুকিয়েই নিয়ে যাচ্ছি—

—না লুকিয়ে নিয়ে গেলি নোকে চেয়ে নেবে। না দিলি কান্নাকাটি করবে, এমন মুশকিল হয়েছে। আমাদের গাঁয়ে তোদোর বন্ধ না করে দুপুরে খেতে বসবার জো নেই। সবাইএসে বলবে, ভাত দ্যাও। দেখে দুঃখুও হয়—কিন্তু কতজনকেদেবেন আপনি ?খ্যামতা যখন নেই, তখন দোর বন্ধ করেথাকাই ভালো। একটা কথা বলি—

—কি ?

—যদি কখনো এমন হয়, না খেয়ে থাকতি হয়, তবেআমার কাছে আসবেন, আমি যা পারি দেবো। আমার নিজের সোয়ামী-পুত্তুর নেই, দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাও যদি না করলাম, তবে জীবনে করলাম কি বলুন !

বাড়ি ফিরবার পথে নসরাপুরের বিলের ধারে একটাদোকান। বেলা পড়ে এসেচে। দোকানীকে তামাক খেতে দেখেগঙ্গাচরণ দোকানে গিয়ে উঠে বললে—তামাক খাওয়াও দিকিএকবার—

দোকানী বললে—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ !

—পেরণাম হই।

—জয়স্তু।

দোকানী উঠে গিয়ে একটা কলার পাতা নিয়ে এসে ঠোঙাকরে কল্কে বসিয়ে গঙ্গাচরণের হাতে দিলে—বললে—আপনারনিবাস ?

—নতুনপাড়া, চর পোলতা।

—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—নিবারণের বাড়ি, ও গাঁয়ের নিবারণ ঘোষ।

—বাবাঠাকুরের পুঁটুলিতে কি ?চাল ?

—হ্যাঁ বাপু।।

—ঢেকে রাখুন। এসব দিকে বড্ড আকাল। এখুনি এসেঘ্যান ঘ্যান করবে সবাই।

গঙ্গাচরণ বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটি দুলে বাগদি জাতীয় স্ত্রীলোক এসে আঁচলে বেঁধে কলাই নিয়ে গেল। একজন নিয়ে গেল অপকৃষ্ট পাতা চা ও একটি ছোট্ট পাথরবাটিতে এক বাটি গুড়। দোকানী বললে—বসুন ঠাকুরমশায়—

—না বাপু, আমি যাবো অনেকদূর—উঠি।

—না, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে। আর তো কিছুদেওয়ার নেই, বসুন—

—চা খাবো আবার !

—হ্যাঁ, একটুখানি খেয়ে যান দয়া করে।

আরো পাঁচ-ছটি খদ্দের দোকানে এল গেল। সকলেইনিয়ে গেল কলাই। শুধু কলাই, আর কিছু নয়।

চা একটু পরে তৈরি হয়ে এল, একটা কাঁচের গ্লাসে করেদোকানী ওকে চা দিলে। গঙ্গাচরণ লক্ষ্য করলে দোকানেরমধ্যে তাকে, মেজের ওপর, নানা জায়গায় পেতল কাঁসারবাসন থরে থরে সাজানো। বেশিরভাগ থালা আর বড় বড়জামবাটি। গঙ্গাচরণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, এরা কিকাঁসারি ?বাসন কেন এত বিক্রির জন্যে ?

দোকানী আবার তামাক সাজলে। গঙ্গাচরণের মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—ও বাসন অত দেখচেন, ওসব বাঁধা দিয়ে গিয়েচে লোকে। এ গাঁয়ে বেশিরভাগ দুলে বাগদি আর মালো জাতের বাস। নগদ পয়সা দিতি পারে না, ওই সববাসন বাঁদা দিয়ে তার বদলে কলাই নিয়ে যায়।

—সবাই কলাই খায় ?

—তা ছাড়া কি মিলবে ঠাকুরমশায় ! ওই খাচ্চে—

—তোমার চাল নেই ?

—না ঠাকুরমশায়।

—আমি দাম দেবো, সত্যি কথা বলো। নগদ দাম দেবো।

—না ঠাকুরমশায়। হাত জোড় করে বলচি ও অনুরোধকরবেন না !

—তোমরা কি খাও বাড়িতে ?

—মিথ্যে কথা বলবো না, ভাত চার আনা, কলাই বারো আনা। ডাটা শাক দুটো করেলাম বাড়িতে, তা সে রাখবারউপায় নেই। দিনমানেই ক্ষেতে লোকজন, মেয়েছেলে, খোকা-খুকিরা ঢুকে গোছা গোছা উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাবাড় করে দিয়েচে সব। কিছু রেখে খাবার জো নেই। চালকুমড়োফলেছিল গোটাকতক এই দোকানের চালে, কে তুলে নিয়েগিয়েছে।

গঙ্গাচরণ তামাক খাওয়া সেরে ওঠবার যোগাড় করলে, দোকানী বললে-ঠাকুরমশায় কলাই নেবেন ?

—দাও।

—নিয়ে যান সেরখানেক। এর দাম আপনাকে দিতেহবে না। আর একটা জিনিস—দাঁড়ান, গোটাকতক পেয়ারাদিই নিয়ে যান, আমার গাছের ভালো পেয়ারা—তাও আরকিছু নেই, সব পেড়ে নিয়ে গেল ওরা। আমিডাঁসা দেখেদশ-বারোটা জোর করে কেড়ে নিয়ে রেখেছিলাম।

গঙ্গাচরণ বাড়ি পৌঁছে দেখলে অনঙ্গ-বৌ চুপ করে শুয়েআছে। এমন সময়ে সে কখনো শুয়ে থাকে না।

গঙ্গাচরণ জিজ্ঞেস করলে—শুয়ে কেন ?শরীর ভালোতো ?দেখি—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণাকাতর হয়ে বললে—কাউকে ডাকো।

—কাকে ডাকবো ?

কাপালীদের বড়-বৌকে ডাকো চট করে। শরীর বড্ডখারাপ—

গঙ্গাচরণ বড় ছেলেকে বললে-দৌড়ে যা কাপালী বাড়ি—বলগে এক্ষুনি আসতে হবে ! মার শরীর খারাপ—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো, কখনো ওঠে কখনো বসে। যূপবদ্ধ আর্ত পশুর মতো চিৎকার। গঙ্গাচরণনিরুপায় অবস্থায় বাইরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, আকাশে পঞ্চমী তিথিরএক ফালি চাঁদ উঠেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে লেবুঝোপে। গঙ্গাচরণআর সহ্য করতে পারছে না অনঙ্গ-বৌয়ের চিৎকার। ওর চোখে প্রায় জল এল। ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে আশেপাশেরবাড়ির মেয়েছেলে এসে গিয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সীকে ডেকে গঙ্গাচরণ উদভ্রান্তসুরে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ দিদিমা, বলি ও অমন করছে কেন ?

ঠিক সেই সময় একটা যেন মৃদু গোলমাল উঠলো। একটিশিশুকণ্ঠের ট্যাঁট্যাঁ কান্না শোনা গেল। বার-কয়েক শাক বেজে উঠলো।

সতীশ কাপালীর মেয়ে বিন্দি বাড়ির ভেতর থেকে ছুটেএসে বললে—ও দাদাবাবু, বৌদিদির খোকা হয়েচে—এখনসন্দেশ বের করুন আমাদের জন্যে—দিন টাকা

গঙ্গাচরণের চোখ বেয়ে এবার সত্যিই ঝর ঝর করেজল পড়লো।

তারপর দিনকতক সে কি কষ্ট ! প্রসূতিকে খাওয়ানোরকি কষ্ট ! না একটু চিনি, না আটা, না মিছরি। অনঙ্গ-বৌ শুয়েথাকে, নবজাত শিশু ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদে, গঙ্গাচরণ কাপালীদেরবড়-বৌকে বলে—ওর খিদে পেয়েচে, মুখে একটু মধু দ্যাওখুড়ি—

—মধু খেয়ে বমি করেছে দুবার। মধু পেটে রাখছে না।

—তবে কি দেবে খুড়ি, দুধ একটু জ্বাল দিয়ে দেবো?

—অত ছোট ছেলে কি গাইয়ের দুধ খেতে পারে ?আরইদিকি আঁতুড়ে-পোয়াতি ঘরে, তার খাবার কোনো যোগাড়নেই। হিম হয়ে বসে থাকলে চলবে না বাবাঠাকুর, এর যোগাড়কর।

গ্রামে কোনো কিছু মেলে না, হাটেবাজারেও না। আটাসুজি বা চিনি আনতে হলেযেতে হবে মহকুমা শহরে সাপ্লাইঅফিসারের কাছে। গঙ্গাচরণ দু'একজনের সঙ্গে পরামর্শ করেঠিক করলে, মহকুমা শহরেই যেতে হবে।

সাড়ে সাত ক্রোশ পথ।

সকালে রওনা হয়ে বেলা এগারোটার সময় সেখানে পৌঁছলো। এখানে দোকানে অনেক রকম জিনিস পাওয়াযাচ্ছে। গঙ্গাচরণের হাতে পয়সা নেই, জলখাবারের জন্য মাত্র দু'আনা রেখেছিল, কিন্তু খাবে কি, চিঁড়ে পাঁচসিকে সের, মুড়িও তাই। মুড়কি চোখে দেখবার জো নেই। দু'আনার মুড়িএকটা ছোট্ট বাটিতে ধরে।

ক্ষেত্র কাপালী বললেও দাদাঠাকুর, এ যে ভয়ানককাণ্ড দেখছি ! খাবা কি ?

গঙ্গাচরণ ও ক্ষেত্র কাপালী সাপ্লাই অফিসারের অফিসেএসে দেখলে সেখানে রথযাত্রার ভিড়। আপিসঘরের জানলাদিয়ে পারমিট বিলি করা হচ্ছে, লোকে জানলার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পারমিট নিচ্চে। সে ভিড়ের মধ্যে ছত্রিশ জাতিরমহাসম্মেলন। দস্তুরমতো বলবান ব্যক্তি ছাড়া সে ব্যূহ ভেদকরে ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব। ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝেতাড়া শোনা যাচ্চে, লোকজন কিছু কিছু পিছিয়ে আসছে, কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্বের অবস্থা, ভিড়ের স্থিতিস্থাপকত্বদিব্যি বেশি।

গঙ্গাচরণ হতাশভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। ভিড় কমবার নাম নেই, বরং ক্রমবর্ধমান। গরমও তেমনি, আকাশে মেঘ জমে গুমটের সৃষ্টি করেছে। এক ঘণ্টা কেটে গেল হঠাৎ ঝুপ করে জানলা বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল হাকিম আহার করতে গেলেন, আবার কখন আসবেন তারকিছু ঠিক নেই। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল—লোকজন কতক গিয়ে আপিসের সামনে নিমগাছের তলায় বসে বিড়িটানতে লাগলো।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ঠাকুরমশাই, কি করবেন ?

—বসি এসো।

—চলুন, বাজারে গিয়ে খোঁজ করি, যদি দোকানে পাই।এ ভিড়ে ঢুকতি পারবেন না।

বাজারে গিয়ে প্রতি দোকানে খোঁজ করা হল। জিনিসনেই কোনো দোকানে। পাতিরাম কুণ্ডুর বড় দোকানে গোপনেবললে—সুজি দিতে পারি, দেড় টাকা সের। লুকিয়ে নিয়েযাবেন সন্দের পর।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—আটা আছে ?

—আছে, বারো আনা করে সের।

—মিছরি ?

—দেড় টাকা সের। সন্দের পর বিক্রি হবে।

গঙ্গাচরণ হিসেব করে দেখলে, কাছে যা টাকা তাতেবিশেষ কিছু কেনা হবে না। পারমিট পেলে সস্তায় কিছু বেশিজিনিস পাওয়া যেতে পারে।

আবার ওরা দুজনে সাপ্লাই অফিসারের আপিসে এল, তখন ভিড় আরও বেড়েছে কিন্তু জানলা খোলে নি।

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসে আছেন। গঙ্গাচরণ বিড়ি খাওয়ারজন্য তার কাছে গেল—জিজ্ঞেস করলে—আপনার নিবাসকোথায় ?

—মালিপোতা।

—সে তো অনেক দূর ! কি করে এলেন ?

—হেঁটে এলাম, আবার কিসে আসবো ?গরিব লোক, এ বাজারে নৌকো কি গাড়িভাড়া করে আসবার খ্যামতা আছে ?

—কি নেবেন ?

—কিছু খাবার নেই ঘরে। আমার বিধবা পিসি ঘরে, তারএকাদশী আসচে। দশমীর দিন রাত্তিরে দুখানা রুটি করেও তোখাবেন। তাই আটা নিতে এসেছি।

—চাল পাচ্ছেন ওদিকে ?

—পাবো না কেন, পাওয়া যায়। দু'টাকা কাঠা—তাও অনেক খুঁজে তবে নিতি হবে। খাওয়া হয় না মাঝে মাঝে।

এই সময় জানলা খোলার শব্দ হতেই লোকের ভিড় সেই দিকেই ছুটলো। গঙ্গাচরণ বৃদ্ধের হাত ধরে বললে— শীগগির আসুন, এর পর আর জায়গা পাব না—

তাও এরা পিছিয়ে পড়ে গেল। অতগুলো মরীয়া লোকেরসঙ্গে দৌড়পাল্লায় প্রতিযোগিতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হলনা। এদের পক্ষে বেশির ভাগ এসেচে আটা যোগাড় করতে।

একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে দুপুরবেলা চালযোগাড় না করতে পেরে উপবাসে আছে, একটু আটা নিয়েগেলে তবে তার দিনের আহার পেটে পড়বে। তারা মরীয়াহবে না তো মরীয়া হবে কে ?

আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর গঙ্গাচরণ জানলারসামনে দাঁড়াবার জায়গা পেলে।

সাপ্লাই অফিসার টানা টানা কড়া সুরে জিজ্ঞেসকরলেন—কি ?

গঙ্গাচরণের ভরসা ছিল তার চেহারার দিকে চাইলেসাপ্লাই অফিসার ভদ্রলোক বা ব্রাহ্মণ বলে খাতির করবে। কিন্তুতাতে নিরাশ হতে হল, কারণ হাকিম চোখ তুলে তার দিকে চাইলেন না। তাঁর চোখ টেবিলের ওপরকার কাগজের দিকে। হাতে কলের কলম, অর্থাৎ যে কলম কালিতে ডোবানোরদরকার হয় না।

গঙ্গাচরণের গলা কেঁপে গেল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপকরতে লাগলো। হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

সে বললে—হুজুর, আমার স্ত্রী আঁতুড়ে। কিছু খাবার নেই, আঁতুড়ের পোয়াতি, কি খায়, না আছে একটু আটা—

হাকিম ধমকের সুরে বললেন—আঃ কি চাই ?

—আটা চিনি সুজি, একটু মিছরি—

—ওসব হবে না।

—না দিলে মরে যাবো হুজুর। একটু দয়া করে—

—হবে না। আধসের আটা হবে, এক পোয়া সুজি, একপোয়া মিছরি—বলেই খশ্ খশ্ করে কাগজে লিখে হাকিম গঙ্গাচরণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন-যাও—

—হুজুর, পাঁচ-ছ'কোশ দূর থেকে আসছি। এতে ক'দিনহবে হুজুর। দয়া করে কিছু বেশি করে দিন—

—আমি কি করবো ?হবে না যাও—

গঙ্গাচরণ হাত জোড় করে বললে—গরিব ব্রাহ্মণ, দয়াকরে আমায়—

হাকিম বিরক্তির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখিকাগজ ?যাও, এক সের আটা—যত বিরক্ত—

লোকজনের ধাক্কায় গঙ্গাচরণকে ছিটকে পড়তে হল জানলা থেকে। পেছন থেকে দু-একজন বলে উঠলো—ওমা, দেরি করো কেন ?কেমনধারা লোক তুমি ?সরো—

চাপরাশী চেঁচিয়ে বললে—হঠ্ যাও—

বাজারে দোকান থেকে আটা কিনতে গিয়ে দেখলে আটাএবং সুজি দুই-ই খারাপ, একেবারে খাদ্যের অনুপযুক্ত নয়বটে তবে জিনিস ভালও নয়।

একটা ময়রার দোকানে ওরা খাবার খেতে গেল। ক্ষেত্রকাপালীর বড় ইচ্ছে সে গরম সিঙাড়া খায়। শহর বাজারে তো প্রায় আসা হয় না—থাকে নিতান্ত অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তুখাবারের দোকানে সিঙাড়া কিনতে গিয়ে সে দেখলে পানের খিলি অপেক্ষা একটু বড় সিঙাড়া একখানার দাম দু পয়সা।জিনিসপত্রের আগুন দর। সন্দেশের সের এ অঞ্চলে চিরকালছিল দশ আনা, বারো আনা—এখন তাই হয়েছে তিন টাকা। রসগোল্লা দু'টাকা।

ক্ষেত্র কাপালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—কোনো জিনিস কিনবার জো নেই ঠাকুরমশাই !

—তাই তো দেখচি—

—কি খাবো বলুন তো ?এ তো দেখচি এক টাকার কমখেলি পেট ভরবে না। আপনি খাবান না ?

—না, আমি কি খাবো ?আমার খিদে নেই।

—সে হবে না ঠাকুরমশাই। আমার কাছে যা পয়সা আছে, দুজনে ভাগ করে খাই।

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—কেন মিছে মিছে বাজেকথা বলিস ?খেয়েনিগেযা—

কিন্তু গঙ্গাচরণের বড় লোভ হল একখানা থালায় সাজানো বড় বড় জোড়া সন্দেশ দেখে। তার নিজের জন্যে নয়, অনঙ্গ-বৌ কতকাল কোনো জিনিস খায় নি। ওর জন্যেযদি দুখানাও নিয়ে যাওয়া যেতো।

ক্ষেত্র কাপালী গরম সিঙাড়া খেয়ে জল খেয়েপানের দোকানে পান কিনতে গিয়েছে—ও তখন ময়রাকেবললে-তোমার ঐ জোড়া সন্দেশের দাম কত ?

—চার আনা করে।

—দুখানা চার আনা?

—সেকাল নেই ঠাকুর। একখানার দাম চার আনা।

গঙ্গাচরণ অবাক হল। ওই জোড়া সন্দেশের একখানিরদাম ছিল এক আনা। সেই জায়গায় একেবারে চার আনা ! সে কি কেনা ওর চলবে ?অসম্ভব। হাতে অত পয়সা নেই।গঙ্গাচরণ বার বার জোড়া সন্দেশের দিকে চাইতে লাগলো।সুন্দর সন্দেশ গড়েচে। কারিগর ভালো।

ঠোঙা থেকে বের করেই যদি অনঙ্গর হাতে দেওয়াযেতো !

—ওগো, দ্যাখো কি এনেচি—

—কি গা ?

—কেমন জোড়া সন্দেশ, দেখেচ ?তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

কখনো স্ত্রীর হাতে কোনো ভালো খাবার তুলে দেয় নি।পাবেই বা কোথায়?কবে সচ্ছল পয়সার মুখ দেখেছে সে ?তার ওপর এই ভীষণ মন্বন্তর।

ক্ষেত্র কাপালীর কাছেও পয়সা নেই যে বার করবে। সেপেটুক ব্যক্তি। বসে বসে, যা কিছু এনেছিল, জিলিপি আরসিঙাড়া কিনেই ব্যয় করেছে।

বেলা পড়ে এসেচে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা। দুজনে পথ হেঁটে চললো গ্রামের দিকে। ক্ষেত্র কাপালী বিড়ি টানচে আর বকবক করে বকচে। গঙ্গাচরণ চাদরের প্রান্তে দুটি মুড়ি-মুড়কি বেঁধে নিয়েছে মাত্র দু'আনার। এত অল্প

জিনিস যেকয়েকমুঠো খেলেই ফুরিয়ে যাবে। ছেলে দুটো বাড়িতে আছে, বলবে এখন, বাবা কি এনেচ আমাদের জন্যে ?ছেলেমানুষ, তারা কি মন্বন্তর বোঝে ?তাদের জন্যে দুটো নিয়ে যেতেহবে, দুটো ও খাবে একটা ভালো পরিষ্কার জায়গায় বসে ?খেয়ে নদীর জল পান করবে। সারাদিন অনাহার—ক্ষুধা ওতৃষ্ণা দুই-ই প্রবল।

এক জায়গায় গাছতলায় বসে গঙ্গাচরণ দু'তিন মুঠো মুড়ি-মুড়কি খেয়ে নিয়ে জলে নামতে গিয়ে দেখলে একটাশেওলা দামের ওপারে অনেক কলমীশাক। আজকাল দুর্লভ—শাকপাতা কি লোক রাখচে ?ক্ষেত্র কাপালীকেবললে—জলে নামতে পারবি ?শাক নিয়ে আয় তো দিকি—

ক্ষেত্র কাপালী গামছা পরে জলে নেমে একগলা জলথেকে দাম টেনে এনে কলমীলতার ঝাঁক ডাঙার কাছে তুললে।তারপরে দুজনে মিলে শাক ছিঁড়ে বড় দু'আঁটি বাঁধলে।

বাড়ি ফিরতেই অনঙ্গ-বৌ ক্ষীণস্বরে বললে—ওগো, এলে ?এদিকে এসো—

—কেমন আছ ?

—এখানে বোসো। কোথায় গিইছিলে এতক্ষণ ?কতক্ষণযেন দেখি নি—

—টাউনে গেলাম তো। তোমাকে বলেই তো গেলাম। জিনিসপত্র নিয়ে এলাম সব।

অনঙ্গ নিস্পৃহ উদাস সুরে বললে—বোসো এখানে। সারাদিন টো টো করে বেড়াও কোথায় ?তোমায় একটুওদেখতে পাই নে।

গঙ্গাচরণের মনে বড় কষ্ট হল ওকে দেখে। বড় দুর্বলহয়ে পড়েছে অনঙ্গ-বৌ। এমন ধরনের কথাবার্তা ও বড় একটাবলে না। এ হল দুর্বল রোগীর কথাবার্তা। অনাহারে শীর্ণদুর্বল হয়ে পড়েছে, কতকাল ধরে পেট পুরে খেতে পেতোনা, কাউকে কিছু মুখ ফুটে বলা ওর স্বভাব নয়, কত সময় নিজের বাড়া ভাত অপরকে খেতে দিয়েচে। শরীর সে সবের প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন।

গঙ্গাচরণ সস্নেহে বললে—তুমি ভালো হয়ে ওঠো।তোমাকে জোড়া সন্দেশ এনে খাওয়াবো টাউন থেকে। হরিময়রা যা সন্দেশ করেচে ! দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু বড় দুর্বল, শীর্ণদেহ। খেতেই পায় না তা সারবে কোথা থেকে ?গঙ্গাচরণ প্রাণপণে চেষ্টা করে খাবারের এটা-সেটা যোগাড় করতে, কিন্তুপেরে ওঠেনা। একটু ঘি কত কষ্টে গঙ্গানন্দপুরের শশী ঘোষের বাড়ি থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল। তাও ঘোষমশায় আট টাকা সেরের কমে ছাড়তে চায় না। ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়েঅনেক করে ঘিটুকু যোগাড় করা।

ঘি যদি বা মেলে দূর গ্রামে, নিজ গ্রামে না মেলে একটুদুধ, না একটু মাছ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওগো, তুমি টো টো করে অমনবেড়িয়ো না।তোমার চেহারাটা খারাপ হয়েগিয়েছে। আয়নায়মুখখানা একবার দেখো তো—

গঙ্গাচরণ বললে—দেখা আমার আছ। তুমি ঠাণ্ডা হও তো।

—চাল পেয়েছিলে ?

—অল্প যোগাড় করেছিলাম কাল।

—তোমরা খেয়েছ ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরুলেও নড়তে চড়তে পারে না—শুয়েই থাকে। রান্না করে গঙ্গাচরণ ও হাবু। পাঠশালাআজকাল সবদিন হয় না। বিশ্বাস-মশায় এখান থেকে সরে যাওয়াতে পাঠশালার অবস্থা ভালো নয়। এ দুর্দিনে আকস্মিকবিপৎপাতের মতো দুর্গা ভট্চায একদিন এসে হাজির।গঙ্গাচরণ পাঠশালাতে ছেলে পড়াচ্চে।

—এই যে পণ্ডিতমশায় !

গঙ্গাচরণ চমকে গেল। বললে—আসুন, কি ব্যাপার ?

—এলাম।

—ও, কি মনে করে ?

—মা ভালো আছেন ?

—হুঁ।

—সন্তানাদি কিছু হল ?

—হয়েছে।

গঙ্গাচরণ তখনো ভাবছে। দুর্গা ভট্চাযের মতলবখানাকি ?ভট্চায কি বাড়ি যেতে চাইবে নাকি ?কি মুশকিলেই সেপড়েচে ! কত বড়লোক আছে দেশে, তাদের বাড়িতে যা না কেন বাপু ! আমি নিজে পাইনে খেতে, কোনো রকমে ছেলেদুটোর আর রোগা বউটার জন্যে দুটি চাল আটা কত কষ্টেযোগাড় করে আনি, ভগবান তা জানেন। থাকে থাকে, এভ্যাজাল কোথা থেকে এসে জোটে তার মধ্যে।

দুর্গা একটা ছেলেকে উঠিয়ে তার কেরোসিন কাঠেরবাক্সটার ওপর বসলো, তারপর গলার উড়ুনিখানা গলা থেকেখুলে হাঁটুর ওপর রেখে বললে—একটু জল খাওয়াতে—

—হ্যাঁহ্যাঁ। ওরে পটলা, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়েআয় দিকি ঘটিটা মেজে।

—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে, বলচি—জলটা খাই। তেষ্টায় জিব শুকিয়ে গিয়েছে।

জল পান করে দুর্গা পণ্ডিত একটু সুস্থ হয়ে বললে—আঃ !

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর দুর্গাই প্রথম বললে— বড় বিপদে পড়েচি, পণ্ডিত মশাই—

—কি ?

—এই মন্বন্তর, তার ওপর চাকরিটা গেল।

—পাঠশালার চাকরি ?

—হ্যাঁ মশাই। হয়েচে কি, আমি আজ ন'টি বছর কামদেবপুর পাঠশালায় সেকেন পণ্ডিতি করচি, মাইনে আগে ছিল সাড়ে তিন টাকা, এখন দেয় পাঁচ টাকা। তা মশাই, গোয়ালা হল ইস্কুলের সেক্রেটারি। আজ পাঁচমাস হল কোথা থেকে এক গোয়ালার ছেলে জুটিয়ে এনে তাকে দিয়েছেচাকরি। সে করলে কি মশাই ! দার্জিলিং গেল বেড়াতে। সেখানথেকে উন্মাদ পাগল হয়ে গেল—

—কেন কেন ?

—তা কি করে জানবো মশাই ?কোথাকার নাকি ফটোগেরাপ তুলতে গিয়েছিল, সায়েবে কি খাইয়ে দেয়—এইতো শুনতে পাই। মশাই, তুমি পাও পাঁচ টাকা মাইনে, তোমার সেই দার্জিলিং-এ যাওয়ার কি দরকার ?সেখানেসায়েব-সুবোদের জায়গা। বাঙালিরা সেখানে গেলে পাগলকরে দেয় ওষুধ খাইয়ে। সাধে কি আর বলে—

—সে যাক, আসল কথাটা কি সংক্ষেপে বলুন—

তারপর সে ছোকরা আজ তিন মাস পরে এসেজুটেছে। এখন আর পাগল নেই, সেরে গিয়েছে। তাকে নেবেবলে আমায় বললে—আপনি এক মাস ছুটির দরখাস্ত করুন—

—আপনি করে দিলেন ?

—দিতে হল। হেডমাস্টার নিজে আমার টেবিলে এসেবলে—লিখুন দরখাস্ত। লিখলাম। কি আর করি ! তখুনি মঞ্জুরকরে দিলে। এখন দেখুন বিপদ। ঘরে নেই চাল, তার ওপরনেই চাকরি। আমি এখন কি করি ?বাড়িসুদ্ধ যে না খেয়েমরে, তাই ভাবলাম যাই আপনার কাছে। একটা পরামর্শ দ্যান। আর তো কেউ নেই যে তাকে দুঃখের কথা বলি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—দুঃখের কথা একবার ছেড়ে একশোবার বলো। কিন্তু বাড়ি যেতে চাও যদি, তবেই তো আসল মুশকিল। দুর্গা ভট্চাযের মতলবখানা যে কি, তাগঙ্গাচরণ ধরতে না পেরে সন্ধিগ্ধদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকেচেয়ে রইল। ছেলে দুটির চাল জোটানো যাচ্চে না, বউটারজন্যে কত কেঁদেককিয়ে এক সের আটা নিয়ে আসা, এইসময় দুর্গা ভট্চায যদি গিয়ে ঘাড়ে চাপে, তবে চোখেঅন্ধকার দেখতে হবে যে দেখচি। স্ত্রীও এমন নির্বোধ, যদিও গিয়ে হাজির হয় আর কাঁদুনি গায় তার সামনে, তবে আরদেখতে হবে না। মুখের ভাত বেড়ে দেবে। নিজে না খেয়েঐ বুড়োটাকে খাওয়াবে।

নাঃ, কি বিপদেই সে পড়েচে।

এখন মতলবখানা কি বুড়োর ?

বসে বসে গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো।

যদি ছুটির পরে দুর্গা ভট্চায তার সঙ্গে তার বাড়ি যেতেচায়, তবে ?

না, ও চলবে না। একটা কিছু ফন্দি বার না করলে চলবে না। এমন কিসের খাতির দুর্গা ভট্চাযের সঙ্গে যেনিজের স্ত্রী-পুত্রের মুখ বঞ্চিত করে ওকে খেতে দিতে হবে?

দুর্গা ভট্চায বলে—ছুটি দেবেন কখন ?

—ছুটি ?এখনো অনেক দেরি।

—সকাল বিকেল করেন, না এক বেলাই ?

—এক বেলা।

গঙ্গাচরণ তামাক সেজে খাওয়ালে নিজের হাতে দুর্গাকে।

দুর্গা তামাক খেয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কোটি গঙ্গাচরণের হাতে দিয়ে বললে—এখন বড় যে বিপদে পড়েগেলাম। চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সা নেই—আপনার কাছে বলতে কি, আজ দু'দিন সপরিবারে না খেয়ে খিদেরজ্বালায় ছুটে এলাম, বলি কোথায় যাই ?আর তো কেউ নেই কোথাও ?মা-ঠাকরুণ দয়া করেন, মা আমার, অন্নপুন্নোআমার। তাই—

এর অর্থ সুস্পষ্ট। দুর্গা ভট্চায বাড়িই যাবে। সেইজন্যেইএখনো ওঠে নি, বসে বসে তামাক খাচ্চে। দুদিন খাই নি !সে যখনই আসে, তখনই বলে দুদিন খাই নি, তিনদিন খাইনি। কে মশায় তোমাকে রোজ রোজ খাওয়ায়—আর এইদুর্দিনে ?লোকের তো একটা বিবেচনা থাকা উচিত।

কি মতলব ফাঁদা যায় ?বলা যাবে কি ও বাপের বাড়ি গিয়েচে ?কিংবা ওর বড্ড অসুখ ?উঁহু, তাহলে ও আপদটাসেখানে দেখতে যেতে পারে।

গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভেবে কিছুই পেল না। ছুটিরসময় হয়ে এল। পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ যেমন বাড়ির দিকে চলবে, ও অমনি চলবে গঙ্গাচরণের সঙ্গে। সোজাসুজিকথা বললে কেমন হয় ?না মশাই, এবার আর সুবিধে হবে নাআমার ওখানে। বাড়িতে অসুখ, তার ওপর চালের টানাটানি।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্যে গঙ্গাচরণ প্রস্তুত ছিল না।

বেলা যত যায় দুর্গা ভট্চায মাঝে মাঝে পাঠশালা থেকেনামে আর রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে সেখহাটি-মণিরামপুরেরবিলের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখে।

দু’তিনবার এ রকম করবার পরে গঙ্গাচরণ কৌতূহলেরসুরে বললে—কি দেখছেন?

—এত দেরি হচ্চে কেন, তাই দেখচি।

—কাদের দেরি হচ্চে ?কারা?

—ওই যে বললাম। বাড়ির সবাই আসছে কিনা। আমারস্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে। সব না খেয়ে আছে যে। আরকোনো উপায় তো দ্যাখলাম না। বলি, চলো আমার অন্নপুন্নোমার কাছে। না খেয়ে ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটা বড্ড কাতরহয়ে পড়েছে। দিশেহারা মতো হয়ে গিয়েছে মশাই। তা আমিদুটো কলাইসেদ্ধ খেলাম মণিরামপুরের নিধু চক্কত্তির বাড়ি এসে। তাদেরও সেই অবস্থা। গোয়ালার বামুন, এ দুর্দিনে কোনো কাজকর্ম নেই, পায় কোথায় বলুন ! চাল একদানানেই তাদের ঘরে। সিধু চক্কত্তির বুড়ো মা বুঝি জ্বরে ভুগছে।আজ দু মাস। ওই ঘুষঘুষে জ্বর। তারই জন্যে দুটো পুরনোচাল যোগাড় করা আছে। তিনি খান। ওরা খেতে বসেচেসিদ্ধকলাই। সব সমান অবস্থা। আমি বলি আমি এগিয়ে গিয়েবসি পণ্ডিত মশাইয়ের পাঠশালায়, তোমরা এসো।

সর্বনাশের মাথায় পা !

দুর্গা ভট্চায গুষ্টিসমেত এ দুর্দিনে তারই বাড়ি এসেজুটচে তা হলে ! মতবল করেচে দেখচি ভালোই।

এখন উপায় ?

সোজাসুজি বলাই ভালো। না কি ?

এমন সময় রাস্তা থেকে বালিকা-কণ্ঠে শোনা গেল— ও বাবা—

—কে রে, ময়না ?বলেই দুর্গা পণ্ডিত বাইরে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে, একটিষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পাঠশালার সামনে পথের ওপরদাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে নিয়ে অল্প একটু পরেই দুর্গা পণ্ডিতপাঠশালায় ঢুকে বললে—এই আমার মেয়ে ময়না, ভালো নামহৈমবতী। প্রণাম করো মা—

কি বিষম মুশকিল।

হৈমবতী এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সলজ্জভাবে। বেশসুন্দরী মেয়ে। ওই রোগা-পটকা, দড়ির মতো চেহারা দুর্গাভট্চাযের এমন সুন্দর মেয়ে !

দুর্গা ভট্চায বললে—ওরা সব কই ?

হৈমবতী বললে—ওই যে বাবা গাছতলায় বসে আছে মাআর খোকারা। আমি ওদের কাছে যাই বাবা। বোঁচকা নিয়ে মা হাঁটতে পারছে না।

গঙ্গাচরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এদের তাড়ানো আর তত সহজ নয়। এরা বোঁচকা-কুঁচকি নিয়েআহারের সন্ধানে দেশত্যাগ করে যখন রওনাই হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েটিকে দেখে গঙ্গাচরণের মন নরম হয়েছে। অমনসুন্দরী মেয়ের অদৃষ্টে কি দুঃখ ! খেতে পায় নি আজ দু'দিন।আহা !

স্নেহে গঙ্গাচরণের মন ভরে উঠলো।

একটু পরে পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ সদলবলেবাড়ির দিকে রওনা হল।

এরপর দিনকতক কেটে গেল। গঙ্গাচরণের বাড়িতে দুর্গাভট্চাযের পরিবারবর্গ পাকাপোক্তভাবে বসেচে। অনঙ্গ-বৌনিজে খেতে না পেয়ে চিঁ চিঁ করচে, অথচ সে কাউকে বাড়ি থেকে তাড়াবে না। ফলে সবাই মিলে উপোস করচে।

এর মধ্যে ময়না বড় ভালো মেয়ে, গঙ্গাচরণ ক্রমে লক্ষ্য করলে। কোনো খাবার জিনিস যোগাড় হলে ময়না আগে নিয়ে আসে অনঙ্গ-বৌকে খাওয়াতে।বলে—ও কাকীমা, এটুকুখেয়ে নাও তো !

ময়নার মা আবার বড় কড়া সমালোচক। সে বলে—যা, ও তোর কাকীমাকে দিতে হবে না। ওর শরীর খারাপ, ও তোমার ওই ময়দার গোলা এখন খেতে বসুক। যা, ও নিয়ে যা—

দুর্গা ভট্চায কোথায় সকালে উঠে চলে যায়। অনেকবেলা করে বাড়ি ফেরে। কিছু না কিছু খাবার জিনিস প্রায়ইআনে। চাল আনতে পারে না বটে, কিন্তু আনে হয়তো একটানারকেল, একটা মানকচু, দুটো বিরি কলাই, নিদেন দুটো বড়ি।

এসব আনে সে ভিক্ষে করে।আজকাল দুর্গা ভিক্ষে করতে শুরু করেছে।

তবে তার ভিক্ষেটা ঠিক আর পাঁচজন ভিক্ষুকের মতোনয়, ওরই মধ্যে একটু কায়দা আছে। সেদিনদুপুরে দুর্গা গিয়েহাজির এ গ্রামেরই কাপালীপাড়ায়। নিধু কাপালীর বাড়িরদাওয়ায় উঠে বললে—একটু তামাক খাওয়াতে পার?

নিধু কাপালী ব্রাহ্মণ দেখে শশব্যস্ত হয়ে বললে—আসুন, বসুন, ঠাকুরের কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?

—আমার বাড়ি কামদেবপুর, আমি আছি এই গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ি।

—আপনার কেউ হন ?জামাই নাকি ?

—না না, আমার সজাতি ব্রাহ্মণ। এমনি এসে আছিওঁর ওখানে।

—আপনার কি করা হয় ?

—কিছুই না। বাড়িতে জমিজমা আছে। দুটো গোলা ছিলধানভর্তি, তা শোনলাম ধান রাখতে দেবে না গভর্নমেন্টেরলোক। বিশ মণ ধানের বেশি নাকি রাখতে দেবে না—সববিক্রি করে ফেললাম।

বলা বাহুল্য এসব সর্বৈব মিথ্যা।

নিধুর কিন্তু খুব শ্রদ্ধা হয়ে যায়, দু'গোলা ধানের মালিকযে ছিল এ বাজারে, সে সাধারণ লোক নয়, হতেই পারে না। আঠারো টাকা করে ধানের মণ। দু'গোলায় অন্তত সাত-আট শো মণ ধান ছিল। মোটা টাকা রয়েছে ওর হাতে।

দুর্গা তামাক টানতে টানতে বলে—বাপু হে, ঘরে চিঁড়ে আছে, দুটো দিতে পার ?এ গাঁয়ে তোমাদের দেখছিখাদ্য-খাদকের বড় অভাব।

—আজ্ঞে, এখানে খাদ্যখাদক মেলেই না—চিঁড়ে ঘরে নেই ঠাকুরমশায়। বড় লজ্জায় ফেললেন—

—না না, লজ্জা কি ?তোমাদের এ গ্রামে বাপু এই রকমইকাণ্ড—খাদ্য-খাদক কিছু মেলে না। কদিন থেকে ভাবছি দুটোচিঁড়েভাজা খাব। তা এ যোগাড় করতেই পারলাম না—অথচ আমার গোলায় এক পৌটি দেড় পৌটি ধান ছিল এই সেদিন।

নিধু কাপালী কাঁচুমাচু হয়ে গেল। এত বড় লোকের সামনে কি লজ্জাতেই সে পড়ে গেল।

দুর্গা বললে—যাক গে। আমসত্ত্ব আছে ঘরে ?

—আজ্ঞে না, তাও নেই। ছেলেপিলেরা সব খেয়ে ফেলেদিয়েছে।

পুরনো তেঁতুল ?

—আজ্ঞে না।

—বড় অরুচি হয়ে গেছে মুখে কিনা। তাই দুটোচিঁড়েভাজা, পুরনো তেঁতুল একটু এই সব মুখে—বুঝলেনা?আরে মশায়, লড়াই বেধেছে বলে মুখ তো মানবে না?এই চালকুমড়ো তোমার ?

সামনে গোলার ওপরে চালকুমড়ো লতায় বড় বড়চালকুমড়ো সাদা হয়ে গিয়েচে পেকে। সারি সারি অনেকগুলোআড় হয়ে আছে গোলার চালে। নিধু কাপালী বিনীতভাবেবললে—আজ্ঞে, আমারই।

—দাও একখানা ভালো দেখে। বড়ি দিতে হবে।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, এখুনি—

নিধু হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল এবং একটা বড় পাকাচালকুমড়ো পেড়ে নিয়ে এল গোলার চাল থেকে। দুর্গা ভট্চায সেটি হাতে ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের বাড়ির দিকে রওনাহল হৃষ্টমনে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওটা কি হবে জ্যাঠামশাই ?

—নিয়ে এলাম মা, আনলেই কাজ দেয়। খাবার জিনিস তো ?বড়ি দিয়ো।

—কলাই খেয়ে প্রাণ বেঁচে আছে, বড়ি আর কি দিয়েদেবো জ্যাঠামশাই ?

—আচ্ছা রও, কলাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলচি কালথেকে।

—না জ্যাঠামশাই, আপনি আমাদের বাড়ি এসেছেন, আর বেরুতে হবে না লোকের বাড়ি চাইতে। যা জোটে তাইখাবো।

—কি জান মা, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হল ভিক্ষা। এতেলজ্জা নেই কিছু। আমার নেই, আমি ভিক্ষা করবো। লড়াইবেধেছে বলে পেট মানবে?

—না জ্যাঠামশাই, আপনার পায়ে পড়ি ওতে দরকারনেই।

—আচ্ছা, তুমি চুপ করে থাক। সে ব্যবস্থা হবে।

দুর্গা ভট্চাযগঙ্গাচরণকে সন্ধ্যাবেলা বললে—একটাপরামর্শ করি। চাষাগাঁয়ে জ্যোতিষীর ব্যবসা বেশ চলে। কালথেকে বেরুবেন ?ওদেরই হাতে আজকাল পয়সা।

—সে গুড়ে বালি। আগে চলত, এখন আর চলবে না। চাল ডাল কেউ দিতে পারবে না। পয়সা হয়তো দেবে কিন্তু চাল দেবে কে ?কিনবেন কোথায় ?

—ধান যদি দ্যায়?

—কোথাও নেই এদেশে। সে যার আছে, নুকিয়েরেখেচে, বের করলে পুলিশের হাঙ্গামা। ভয়ে গাপ করেফেলেচে সব। চাষা-গাঁয়ের হালচাল আমাকে শেখাতে হবে না।

—তাহলেও কাল দুজনে বেরুই চলুন। নয়তো না খেয়েমরতে হবে সপরিবারে।

—যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেইহবে। জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা।

গঙ্গাচরণ একটু দম নিয়ে আবার বললে—নাঃ, ওজ্যোতিষ-টৌতিষ নয়, এবার যদি নিজের হাতে লাঙ্গল ধরেচাষ করতে হয় তাও করব—একটু জমি পেলে হয়।

দুর্গা হেসে বললে—জমির অভাব নেই এদেশে।নীলকুঠির আমল থেকে বিস্তর জমি পড়ে। আমারই বাড়িরআশেপাশে দু'বিঘে জমি জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েছে। আমারভিটেজমির সামিল সে জমি।

—আপনি করেন না কেন ?

—কি করবো তাতে ?

—যা হয়, রাঙা আলু করলেও পারতেন। তাই খেয়েওদুমাস কাটত। আমাদের ভদ্রলোকের কতকগুলো মস্ত দোষআছে। পরের পরিশ্রমে আমরা খাব। আপনি আমি এমনকিছু দুশো টাকার চাকরি করিনে, অথচ জমি করব না। এবার টের পাচ্ছি মজা।

দুর্গা ভট্চায ওসব বোঝে না। সকলেই চাষ করবে নাকি ?মজার কথা ! ও হল বৈশ্যের কাজ, ব্রাহ্মণে বৈশ্যের কাজকরবে ?তা কালে কালে তাও হবে। তিনি শুনেচেন শহরেনাকি কোন্ বামুনের ছেলে জুতোর দোকান করেচে—জুতোর দোকান, ভেবে দ্যাখ ! ব্রাহ্মণের আর কি হতে বাকি রইল ?

কাপালীদের বড়-বৌ এসে অনঙ্গ-বৌকে ফিস্‌ফিস্ করেবললে—কাল থেকে ছোট-বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনঙ্গ-বৌ বললে—সে কি কথা?

—তারে তো জান বামুন-দিদি ! ক্যামন স্বভাব ছেল তার। ইটখোলার সেই এক ব্যাটার সঙ্গে—তুমি সতীনক্ষি, সেসব তোমার সঙ্গে বলব না। এখন কাল বিকেল থেকে আর বাড়িতে দেখছি নে। ঘরের বৌ গেল কোথায় ?জাত যায় যে এখন !

—যাক, কারো কাছে বোলো না।

—কার কাছে আর বলতে যাচ্ছি দিদি?বলে কাটা কান চুল দে ঢাকো, তবুও তো লোকে জিজ্ঞেস করবে কোথায় গেল ?সদু জেলেনী এখুনি ঢোকবে এখন বাড়িতে। সে রটাবেএখন সারা গাঁয়ে। কি দায়েই আমি পড়িচি !

দু'দিনের মধ্যে ছোট-বউয়ের টিকি দেখা গেল না। খোঁজাখুঁজি যথেষ্ট করা হয়েছে। কালীচরণ নিজেও আশেপাশের গ্রামে সন্ধান করেছে।

অনঙ্গ-বৌ রাত্রে বলে—কি হল?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কি আর হবে ?সে পালিয়েছেসেই যদু-পোড়ার সঙ্গে—সেই ঠিকেদার ব্যাটা, ভয়ানকধড়িবাজ।

—ওমা সে কি সব্বোনাশ ! হ্যাঁগো কি হবে ওর ? ছুটকির ?

—ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে শখ মিটে গেলে।তখন নাম লেখাতে হবে শহরে গিয়ে, নয়তো ভিক্ষে করতে হবে।

চতুর্থ দিন অনেক রাত্রে কে এসে ডাকলে ঘরের বাইরেথেকে—

—ও বামুন-দিদি—

ময়না জেগে উঠে বললে—কে ডাকচে বাইরে, ও দিদিবলে—

সে উঠে দোর খুলে দিতে ছোট-বৌ ঘরে ঢুকল। পরনেনতুন কোরা লালপেড়ে শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ, হাতে নতুনকাঁচের চুড়ি।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের ও আনন্দের সুরে বললে—কি রেছোট-বৌ ?

ছোট-বৌ মেঝের ওপর বসে পড়ল। একটুখানি চুপকরে থেকে ফিক করে হেসে ফেলল। ময়নার মাও ততক্ষণ উঠেছে। ছোট-বৌয়ের কাণ্ড সব শুনেছে এ ক'দিনে। ময়নার মা ছিল কামদেবপুর গাঁয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ মেয়েমানুষ। কখনো কারো কথায় থাকে না, গরিব ঘরের বৌ-দুঃখ-ধান্দার মধ্যে চিরকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গুলোকে মানুষ করেএসেচে। সে শুধু চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমনঅবস্থায় আবার লোকের মুখে হাসি বেরোয় ?ময়নার মা এইকথাই ভাবছিল।

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—হাসি কিসের ?

ছোট-বৌ মুখ চুন করে বললে—এমনি।

—ও পুঁটলি কিসের।

—ওতে চাল। তোমার জন্নি এনিচি।

—ঝাঁটা মারি তোর চালের মাথায়। নিয়ে যা এখানথেকে। আমি কি করবো তোর চাল ?

—রাগ কোরো না বামুন-দিদি, পায়ে পড়ি ! তুমি রাগকল্লি আমি কনে যাব ?

এবার ছোট-বৌয়ের চোখ দুটি যেন জলে ভরে এল।সত্যিকার চোখের জল।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনটা নরম হল। খানিকটা স্নেহের সুরে বললে—বদমাইশ কোথাকার !ধাড়ি মেয়ে, তোমার কাণ্ডজ্ঞাননেই, কি কাজ করতে কি কাজ করে বসো তোমার জ্ঞান হয় না?আজ বাদে কাল কোথায় গিয়ে জবাবদিহি করতে হবেসে খেয়াল হয় না তোমার ?সতের ঝাঁটা মারি তোমার মাথায়তবে যদি এ রাগ যায়।

অজ্ঞান পাপীকে ভগবানও বোধ হয় এমনি সস্নেহে অনুযোগের সুরে তিরস্কার করেন। ছোট-বৌ মুখ চুন করেমাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

এরই মধ্যে একদিন মতি-মুচিনী অতি অসহায় অবস্থায়এসে পৌঁছলো ওদের গাঁয়ে।

সকালে হাবু এসে বললে—মতি-দিদিকে দেখে এলামমা, কাপালীদের বাড়ি বসে আছে। ওর চেহারা বড় খারাপহয়েছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রকম দেখে এলি ?

—রোগা মতো।

—জ্বর হয়েচে ?

—তা কি জানি ! দেখে আসবো ?

হাবু আবার গেল, কিন্তুমতিকে সেখানে না দেখে ফিরেচলে এল।

আর দুদিন ওর কথা কারো মনে নেই, একদিন সকালেমতি হাবুদের বাড়ির সামনে একটা আমগাছের তলায় এসেশুয়ে পড়লো। ওর হাত-পা ফুলেছে, মুখ ফুলেছে, হাতে একটামাটির ভাঁড়। সারা দুপুর সেখানে শুয়ে জ্বরে ভুগেছে, কেউদেখেনি, বিকেলের দিকে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরবার পথে ওকেদেখে কাছে গিয়ে বললে, কে ?

ওকে চিনবার উপায় ছিল না।মতি অতি কষ্টে গেঙিয়ে বললে—আমি দাদাঠাকুর—

—কে মতি ?এখানে কেন?কি হয়েছে তোর ?

—বড্ড জ্বর দাদাঠাকুর, তিন দিন খাই নি, দুটো ভাতখাবো।

—তা হয়েচে ভালো ! তুই উঠে আয় দিকি, পারবি ?

উঠবার সামর্থ্য মতির নেই। গঙ্গাচরণ ওকে ছোঁবে না।সুতরাং মতি সেখানেই শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ শুনতে পেয়েব্যস্ত হয়ে উঠলো কিন্তু সেও অত্যন্ত দুর্বল। উঠে মতির কাছে।যাওয়ার শক্তি তারও নেই !

বললে—ওগো মতিকে কিছু খেতে দিয়ে এসো—

—কি দেবো?

—দুটো কলাইয়ের ডাল আছে ভিজনো। এক মুঠোদিয়ে এসো।

—ও খেয়ে কি মরবে ?তার জ্বর আজ কতদিন তাকে জানে ?মুখ হাত ফুলে ঢোল হয়েছে। কেন ও খাইয়েনিমিত্তের ভাগী হবো !

—তবে কি দেবো খেতে ?কি আছে বাড়িতে ?খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনঙ্গ। কিন্তু অন্য কিছুই ঘরে নেই। কি খেতে দেওয়া যায়, এক টুকরো কচু ঘরে আছে বটে কিন্তু তা রোগীর খাদ্য নয়। হাবু পুবপাড়ার জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওই কচুটুকু আজ দু'দিন আগে তুলে এনেছিল, দুদিন ধরেই এক এক টুকরো সিদ্ধ খেতে খেতে ওই এক ফালি অবশিষ্ট আছে।

ভেবেচিন্তে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, কচু বেটে জল দিয়ে সিদ্ধ করে দিলে রুগী খেতে পারে না ?

—তা বোধ হয় পারে, মানকচু ?

—জঙ্গুলে মানকচু।

—তা দাও।

সেই অতি তুচ্ছ খাদ্য ও পথ্য একটা কলার পাতায়মুড়ে হাবু মতির সামনে নিয়ে গেল। অনঙ্গ-বৌ অতি যত্ননিয়ে জিনিসটা তৈরি করে দিয়েছে। হাবুকে বলে দিয়েছে ওকে এখানে নিয়ে আসবি, বাইরের পৈঠেতে বিচুলি পেতেপুরু করে বিছানা করে দিলেই হবে। আমতলায় শুয়ে থাকলেকি বাঁচে ?

হাবু গিয়ে ডাকলে,—ও মতি-দিদি, এটুকু নাওমতি ক্ষীণ সুরে বললে—কি ?

—মা খাবার পাঠিয়েছে—

—কে ?

—আমার মা। আমার নাম হাবু, চিনতে পারছো না ?মতি কথা বলে না—খানিকক্ষণ কেটে গেল।হাবু আবার বললে—ও মতি-দিদি ?

—কি ?

—খাবার নাও। মা দিয়েছে পাঠিয়ে।

—শালিক পাখি শালিক পাখি, ধানের জাওলায় বাস— —ও মতি-দিদি ?ওসব কি বলছো ?

—কে তুমি ?

—আমি হাবু। ভাতছালায় আমাদের বাড়ি ছিল, মনেপড়ে?

—বিলির ধারের পদ্মফুল,

নাকের আগায় মোতির দুল—

—ও রকম বোলো না। খেয়ে নাও, গায়ে বল পাবে। —কি ?

—এই খাবার খেয়ে নাও—

—কে তুমি ?

—আমি হাবু, আমার বাবার নাম গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী, পণ্ডিত মশাই ছিলেন, মনে পড়ে না ?

—হুঁ।

—তবে এই নাও খাবার। মা পাঠিয়েছে।

—ওখানে রেখে যাও।

কুকুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি খেয়ে নাও, নিয়ে আমাদেরবাড়ি চলো, মা যেতে বলেছে।

—কে তুমি?

—আমি হাবু। আমার বাবার নাম—

মতি আর কথা বলে না। যেন ঘুমিয়ে পড়লো। হাবু ছেলেমানুষ, আরো দু-তিনবার ডাকাডাকি করে কোনো উত্তর পেয়ে সে কচু বাটাটুকু ওর শিয়রের কাছে রেখে চলেএলো।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কিরে, মতি কই ?নিয়ে এলি নে?

—সে ঘুমুচ্চে মা। কি সব কথা বলে, আবোল-তাবোল, আমার তো ভয়ই হয়ে গেল। খাবার রেখে এসেচি তারশিয়রে।

—আর একবার গিয়ে দেখে আসবি একটু পরে।

—বাবাকে একটু যেতে বোলো,বাবা ফিরলে।

—তুই আর একটু পরে গিয়ে খাবারটুকু খাইয়ে আসবি—

আরো কিছুক্ষণ পরে হাবু গিয়ে দেখে এল মতিসেইভাবেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। উঠলোও না বা ওর সঙ্গেকোনো কথাও বললে না। কচুবাটা সেইভাবে ওর শিয়রেরকাছেই পড়ে। হাবু অনেক ডাকাডাকি করলে, ও মতি-দিদি, ও মতি-দিদি-সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গেসঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিলে, বোধ হয় জল হবে। হাবু খুবব্যস্ত হয়ে পড়লো, বিষ্টিতে ভিজবে এখানে বসে থাকলে।মতি-দিদিও এখানে শুয়ে থাকলে ভিজে মরবে। এখন কিকরা যায় ?

মাকে এসে ও সব কথা বললে।

অনঙ্গ-বৌ বললে, ময়নাকে নিয়ে যা, দুজনে ধরাধরিকরে নিয়ে এসে বাইরের পৈঠেতে শুইয়ে রেখে দে—

ময়না হাসিখুশি—প্রিয় চঞ্চলা মেয়ে !

সে বললে—আমরা আনতে পারবো ?কি জাত কাকীমা?—মুচি।

ময়না নাক সিঁটকে বললে—ও মুচিকে ছুঁতে গেলাম বইকি এই ভরসন্দেবেলা ! আমি পারবো না, আমি না বামুনেরমেয়ে ?বলেই হাসতে হাসতে হাবুর সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল।

দুজনে গিয়ে দেখলে মতি সেইভাবেই শুয়ে আছে, সেইএকই দিকে ফিরে। ওর মাথার শিয়রে সেই কচুবাটা, পাশেএকটা মাটির ভাঁড়।

ময়না গিয়ে ডাকলে, ও মতি— কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

ময়না হাবুর চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধিসুদ্ধি তার আরো একটুপেকেচে, সে আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখেবললে, কাকাবাবু বাড়ি থাকেন তো ডেকে নিয়ে আয় দিকি।

হাবু বললে—কেন ?

—আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে হাবু, একজনকোনো বড় লোককে ডেকে নিয়ে আয় দিকি !

এমন সময় দেখা গেল কাপালীদের ছোট-বৌ সে পথেআসছে। ময়না বললে—ও মাসি, শোনো ইদিকে—

—কি ?

—এসে দেখে যাও, মতি-দিদি কথাবার্তা বলছে না, এমনকরে শুয়ে আছে কেন ?

ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভালো করে দেখলে।

মতি মারা গিয়েছে। সে আর উঠে কচুবাটা খাবে না, ভাঁড়েও আর খাবে না জল। তার জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, তা পথের ধারেই ফেলে রেখে সে পরপারে চলে গিয়েছে।

ছোট-বৌ আর ময়নার মুখে সব শুনে অনঙ্গ-বৌ হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলো।

গ্রামে থাকা খুব মুশকিল হয়ে পড়লো মতি মুচিনীর মৃত্যুহওয়ার পরে। অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউজানত না বা বিশ্বাসও করেনি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে, নদীর জলে এত মাছথাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ওপাশের গ্রামে, তখন মানুষ না খেয়ে মরে?কেউ না কেউখেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।

কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেয়েমানুষ তাহলে তো মরতে পারে। এতদিন যা গল্পে-কাহিনীতেশোনা যেতো, আজ তা সম্ভবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌঁছে গেল। কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না

খেয়ে, কেউতো তাকে খেতে দিলে না ?কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকেবাঁচাতে পারলে না ?সকলের মনে বিষম একটা আশঙ্কার সৃষ্টিহল। সবাই তো তাহলে না খেয়ে মরতে পারে।

দুর্গা ভট্চায সেদিন দাওয়ায় বসে মতি মুচিনীরমৃত্যুদৃশ্য দেখলে। মনে মনে ভাবলে এবার আমার এতগুলোছেলেমেয়েকে খেতে দেবে কে?এদের ঘরে তো খাবার নেই, কোনোদিন এক খুঁচি কলাইয়ের ডাল, কোনোদিন বা একটা কুমড়ো, তাই সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া। দুর্গা ভট্চাযবুড়ো মানুষ, ওর তাতে পেট ভরে না। পেটে খিদে লেগেই আছে, খিদে কোনোদিন ভাঙে না। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।এমনভাবে আর কদিন এখানে চলবে ?

মতির মৃতদেহ আমতলাতেই পড়ে আছে। কত লোক দেখতে আসছে। দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্ছে। আজযা ওর হয়েছে, তা তো সকলেরই হতে পারে। ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটা মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে আমগাছটারতলায়।অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।

দুর্গা ভট্চার্য বললে-তাই তো ভায়া, এখন কি করাযায়?

গঙ্গাচরণ সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। একপাল ছেলেমেয়েনিয়ে এসে ঘাড়ে বসে খাচ্চে এই বিপদের সময়।স্ত্রীর ভয়েকিছু বলতেও পারা যায় না।

বিরক্ত সুরে বললে—কি আর করা যাবে, সকলের যাদশা, আমাদেরও তাই হবে—

—না খেয়ে আর কডা দিনই বা চলবে তাই ভাবছি। একটা হিল্লে না হলি যাই বা কোথায় ?

—একটা হিল্লে কি এখানে বসে হবে, চেষ্টা করে দেখতেহবে।

অনঙ্গ-বৌ কাপড়ের ছোট্ট এতটুকু একটা পুঁটুলিহাতে ওদের দেখিয়ে বললে—এতে কি আছে বলো তো ?জ্যাঠামশাই বলুন তো এতে কি ?

—কি জানি কি ?

—এতে আছে শসার বীজ, নাউয়ের বীজ আর শাঁকআলুর বীজ। কাপালীদের ছোট-বৌ দিয়ে গিয়েছে। এ পুঁতে দেবো আমাদের উঠোনে।

গঙ্গাচরণ বললে—সে আশায় এখন বসে থাক। কবেতোমার নাউ-শসা ফলবে আর তাই খেয়ে দুঃখ ঘুচবে।সবাইকে মরতে হবে এবার মতির মতো।

অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, মতির দেহটা ওখানে পড়ে থাকবে আর শেয়াল-কুকুর খাবে?ওর একটা ব্যবস্থা কর!

—কি ব্যবস্থা হবে ?

—ওর জাতের কেউ এ গাঁয়ে নেই ?

—থাকলেও কেউ আসবে না। কেউ ছোঁবে না মড়া।

—না যদি কেউ আসে, চলো আমরা সবাই মিলে মতিরসৎকার করি গে। ওকে ওভাবে ওখানে পড়ে থাকতে দেবো না।ও বড় ভালোবাসতো আমায়।আমারই কাছে মরতে এলো শেষকালে। ভালোবাসেততা বড্ড যে হতভাগী—

অনঙ্গ-বৌ আঁচলের ভাঁজ দিয়ে চোখ মুছলে।

হৃদয় সকলের থাকে না, যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত। অনঙ্গ-বৌ ছটফট করচে মতির মৃতদেহটা ওভাবেপড়ে থাকতে দেখে। কিছুতেই ওর মনে স্বস্তি পাচ্ছে না। তারনিজের যে সে অবস্থা নয়, তাহলে সে আর ময়না দুজনে মিলে মৃতদেহটার সৎকার করে আসতো।

দুর্গা ভট্চায বললে—চলো ভায়া, আমরা দুজনে যাহোক করে ওটির ব্যবস্থা করে আসি।

গঙ্গাচরণ একটু অবাক হয়ে গেল। দুর্গা ভট্চাযের মুখে পরোপকারের কথা। কিন্তু কার মধ্যে কি থাকে বোঝা কিযায় ?সত্যিই সে তা করলেও শেষ পর্যন্ত ! দুর্গা ভট্চার্য আরগঙ্গাচরণ আর কাপালীদের ছোট-বৌ।

আরো দু'দিন কেটে গেল।

শোনা গেল গ্রাম ছেড়ে অনেক লোক পালাচ্চে।

রাত্রির মধ্যে অর্ধেক লোক চলে গিয়েচে কাপালীপাড়াথেকে।

কাপালীদের ছোট-বৌ সকালে এসে জানালে অনঙ্গবৌকে, সে চলে যাচ্চে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কোথায় যাবি রে ?

—সবাই যেখানে যাচ্চে—শহরে। সেখানে গেলে গোরমেন্টো নাকি খেতে দেচ্চে।

কে বললে ?

—শোনলাম, সবাই বলচে।

—কার সঙ্গে যাবি ?তোর স্বামী যাবে ?

—সে তো বাড়ি নেই। সে আজ দিন পাঁচ-সাত বেগুন বেচতে গিয়েচে শহরের হাটে। আর আজও তো ফিরল না।

—কোথায় গেল ?

—তা কি করে বলবো ?তুমিও যেখানে, আমিওসেখানে।

—তুই যেতে পারবি নে। আমার কথা শোন ছুট্‌কি, তোর অল্প বয়স, নানা বিপদ পথে মেয়েমানুষের। আমার কাছে থাকতুই। আমি যদি খেতে পাই তুইও পাবি। আমার ছোট বোনেরমতো থাকবি। যদি না খেয়ে মরি, দুজনেই মরবো।

কাপালী-বৌ সাতপাঁচ ভেবে চুপ করে রইল। অনঙ্গ-বৌবললে—কথা দে, যাবি নে !

—তুমি যখন বলচো দিদি, তোমার কথা ঠেলতে পারিনে। তাই হবে।

—যাবি নে তো ?

—না। দাঁড়াও দিদি, আমি চট করে এক জায়গা থেকেআসি। এখুনি আসছি।

ইটখোলার পাশে অশথতলায় যদু-পোড়া অপেক্ষা করচে। বেলা আটটার বেশি নয়। ওকে দেখে বললে—এই বুঝি তোমার সকালবেলা ?ইটখোলার কুলিদের হাজরে হয়ে গেল, বেলা দুপুর হয়েছে। ওবেলা কখন গাড়ি নিয়ে আসব ?সন্দের সময় ?

ছোট-বৌ বললে—আনতে হবে না।

যদু-পোড়া আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললে—আনতে হবে নাগাড়ি ?তার মানে কি ?হেঁটে যাবে ?পথ তো কম নয়—

ছোট-বৌ হাত নেড়ে নেড়ে বেশ ভঙ্গি করে কৌতুকেরসুরে বললে—হাঁটবোও না, যাবোও না—

—যাবে না মানে ?

—মানে, যাবো না।

যদু-পোড়া রাগের সুরে বললে—যাবে না তবে আমাকেএমন করে নাচালে কেন ?

—বেশ করিচি।

কথা শেষ করেই কাপালী-বৌফিরে চলে আসবার জন্যেউদ্যত হয়েছে দেখে যদু-পোড়া দাঁত খিচিয়ে বললে—না খেয়েমরছিলে বলে ব্যবস্থা করছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে।

কাপালী-বৌ কোনো উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে চলেগেল।

যদু-পোড়া চেঁচিয়ে ডাক দিলে—শুনে যাও, একটা কথাআছে—

কাপালী-বৌ একবার দূর থেকে চেয়ে দেখলে পিছন ফিরে। একটু ইতস্তত করলে। তারপর একেবারেই চলে গেল।